

বঙ্গ

কমলবাতা

সংখ্যা-অক্টোবর। সাল-২০২৬



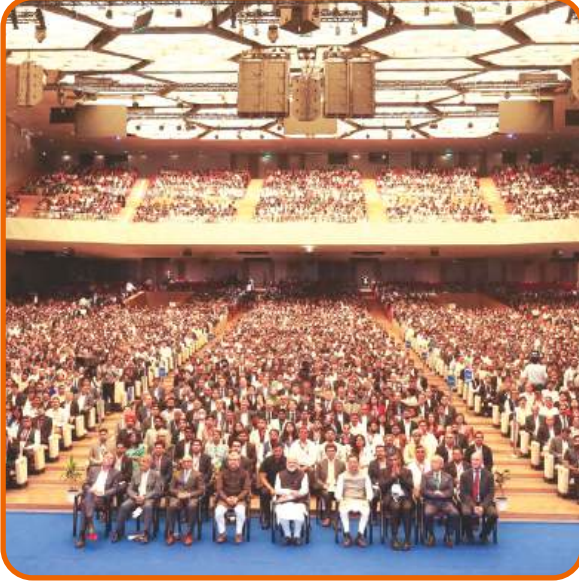
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী হেডগেওয়ার



জ্যাঙ্গো দুর্গা, জ্যাঙ্গো দশপ্রহরগধারিণী



নয়াদিল্লিতে জেন-জি ভজন ক্লাবিংয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।



নয়াদিল্লির যশোভূমিতে 'সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬'-এর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, “এর প্রথম পর্ব ২০২২ সালে হয়েছিল। এ বছর আমরা ব্যবসায়িক চিপ উৎপাদন শুরু করেছি। ভারতের চিপ এখন গোটা বিশ্বে পৌঁছে যাচ্ছে।”



নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পর্যবেক্ষক ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীল বানসাল মহাশয়, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয় সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।



বাঙ্গালীর স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধের আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক দুর্গাপূজা বিনয়ভূষণ দাশ	৪
বেলুড মঠে সনাতনী দুর্গাপূজা পুলক নারায়ণ ধর	৮
দুর্গাপূজাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের সম্মান নরেন্দ্র মোদীর সরকারই এনে দিয়েছে অভিরূপ ঘোষ	১১
রাজনৈতিক সন্ন্যাসী নরেন্দ্র মোদী নারায়ণ চক্রবর্তী	১৩
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাফল্য ও উন্নয়নের নতুন অধ্যায় গৌতম ঘোষ	১৬
ছবিতে খবর	১৮
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পশ্চিমবঙ্গে ভণ্ডামির জায়গা নেই অনিকেত মহাপাত্র	২৪
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী ছিলেন ডাক্তার হেডগেওয়ার অধ্যাপক ডঃ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮
আবারও ভণ্ডুল রাহুলঃ ঘেটে ঘন্ট ইন্ডির পিন্ডি জয়ন্ত গুহ	৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অধ্যাপক ড. অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ

সম্পাদকমণ্ডলী:

অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, শুভজিৎ আওন, অনিকেত মহাপাত্র

সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়



খোকা, খোকা, খোকা আর খোকা। চারিদিকে কত খোকা।
দিল্লিতে খোকা। কালীঘাটে খোকা। দেশে খোকা।
বিদেশে খোকা। খোকা ইলিশ নয়। খোকা বাবু।

খোকাবাবু এল ফিরে। অবশেষে ফিরতেই হল। ঘাপটি মেরে
কখনও কি কোনও কঁদোবাঘ কিংবা কঁচো অনন্তকাল লুকিয়ে
থাকে না থেকেছে? ফিরে তো আসতেই হবে কিন্তু এবারে কিন্তু
খোকা বড় হয়েছে। মনে হল। এবার আর অস্কারের মঞ্চে
সঞ্চালকের মত হাতে মাইক নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মিডিয়ার মুখোমুখি
হলেন না। হয়তো রিস্ক নিলেন না। তাই খোলা আকাশের নীচে না
এসে, ট্রেনের জানালা দিয়ে যেমন ছোলাভাজা কেনে ঠিক তেমন
করেই মিডিয়ায় বাইট দিয়ে ধাঁ। ভুলেও কিন্তু মাথা আর বাইরে বার
করেন না। বাব্বা ওই যা সুপারস্ট্রং মাথা, টিএমটি ইম্পাতের রডকেও
হার মানাবো তো এমন মাথা বাঁচিয়ে না চললে- হাট্টিমাটিম টিম,
তারা মাঠে পাড়ে ডিম... অই দ্যাকো আবার ওইসব অশুভ জিনিস।
না বাবা ওসব থেকে দূরে থাকাই ভাল। সবই ঠিক ছিল যদিও একটা
বিষয় হেবির রহস্যজনক। সাধারণত চোখের 'সমিসি' থাকলে
লোকজন কড়া রোদ থেকে চোখ বাঁচাতে কালো চশমা পড়ে।
এক্ষেত্রে কিন্তু কোনও চশমা-ফশমা ছিল না এবং কথা বলার সময়
একবারও মনে হলনা প্রচণ্ড রোদে চোখের কোনও অসুবিধা হচ্ছে!
যদি অসুবিধা না হয় তাহলে কেন গিয়েছিলেন 'বিদ্যাশে'। লাল
জুতো পায়া খোকাবাবু যায়। আর আসে, বিদেশ থেকে।

আর এসেই এমন একটা কিছু বলতে হবে যাতে পিসিমনি
দিদিমণিরা সব বলে, দ্যাকো দ্যাকো আমাদের খোকাবাবু কত বড়
হয়ে গ্যাছে। কত বুদ্ধি হয়েছে বিদেশ থেকে ফিরে। তো এবার
সবাই যখন অপেক্ষা করছে খোকার বুদ্ধির বহর দ্যাখার জন্য,
খোকা তখন কলকাতাতে বসেই বলছে, আমি কিন্তু
কলকাতাতেই- সবাই ভেবেছিল আর ফিরবোনা। সত্যি খোকা
আমাদের কত জানে। শুধু জানেনা বোধহয় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
নামে বিদেশে নয়, আমাগো দেশেই এক বিখ্যাত কবি ছিলেন যার
বিখ্যাত কবিতা 'উলঙ্গ রাজা'।

খোকাবাবু কিন্তু কোনও একজন নয়। আরও আছে। আরশোলার
মতই ছড়িয়ে আছে ক্যামাক স্ট্রিট থেকে দিল্লি পর্যন্ত। খোকাবাবুরা
আলালের ঘরের দুলাল। দেখলেই মনে পড়ে হরলিকসের বিজ্ঞাপন।
এপাং ওপাং বাপাং। কিন্তু কিলো কিলো হরলিকস গেলার পরও
ক্যামাক স্ট্রিট থেকে দিল্লি- দুই খোকাবাবুই সেই অমলকান্তির গন্ডি
ছেড়ে বেরোতে পারলো না। একজন মুখ্যমন্ত্রী হতে চেয়েছিল।
পারেনি। একজন প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিল। পারেনি। অমলকান্তি
রোদুর হতে চেয়েছিল। হয়নি।

তাতে কি হয়েছে! হবে হবে। একদিন না একদিন হবে। কিছু
হবে। কিছু না কিছু হবে। নিশ্চয়ই হবে। হবে না?



সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজা। ছবি ঋনঃ কলকাতা পুলিশ।



বাঙ্গালীর স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধের আকাজক্ষার মূর্ত প্রতীক

দুর্গাপূজা

বিনয়ভূষণ দাশ

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শরৎকালে, ক্লাইভ যুদ্ধবিজয়ের অঙ্গ হিসেবে নিজে কোন গির্জায় উৎসব না পালন করে হিন্দুদের দুর্গাপূজায় আনন্দোৎসব করেছিলেন। কিন্তু সেটি কোনভাবেই বাংলার প্রথম শারদীয় দুর্গাপূজা ছিল না। ভারতবর্ষে তথা বাংলায় ঠিক কবে দুর্গাকে দেবী হিসেবে অর্চনা করা শুরু হয় তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। তবে যিনিই দুর্গাপূজা প্রথম প্রচলন করে থাকুন, এই পূজা যে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগেই বাংলায় প্রবর্তিত হয়েছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নাই।



সাম্প্রতিককালে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রচলন নিয়ে অনেক বিভ্রান্তিকর মতবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষত বাংলায় বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী একদল মানুষ বাঙ্গালী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিরোধী নানান বিভ্রান্তিকর মতবাদ ছড়িয়ে বাংলার ঐতিহ্যকে কলুষিত করার চেষ্টায় সতত নিয়োজিত। আবার অনেকেই প্রচার করছেন, বাংলায় প্রথম শরৎকালীন দুর্গাপূজা কৃষ্ণনগর অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং তাঁর দেখাদেখি শোভাবাজার রাজবাড়ীর রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই পূজার প্রচলন করেন। হিন্দু বাঙ্গালীর দুর্গাপূজাকে খ্রিস্টান ইংরাজদের তুষ্টি করার একটা পন্থা বলে দেগে দিচ্ছেন বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধীরা। এটা ঠিকই, পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, শরৎকালে ওই দুজন দুর্গাপূজা করেন। ক্লাইভ যুদ্ধবিজয়ের অঙ্গ হিসেবে নিজে কোন গির্জায় উৎসব না পালন করে হিন্দুদের দুর্গাপূজায় আনন্দোৎসব করেছিলেন। এই ঘটনার অবশ্য একটি ইতিবাচক দিকও রয়েছে। এই প্রথম বিদেশীরা এসে এদেশের হিন্দুদের আরাধ্যা দেবীর মূর্তি না ভেঙ্গে তাঁর আরাধনায় शामिल হয়েছিলেন; অথচ এর আগে মূর্তি ভাঙ্গাই ছিল বিদেশী আক্রমণকারীদের মূল কৃত্য। কিন্তু সেটি কোনভাবেই বাংলার প্রথম শারদীয়া দুর্গাপূজা ছিল না। ভারতবর্ষে তথা বাংলায় ঠিক কবে দুর্গাকে দেবী হিসেবে অর্চনা করা শুরু হয় তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। তবে দুর্গাকে দেবী হিসেবে আরাধনা করার সূত্র পাওয়া যায় এদেশের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদের রাত্রিসুক্তমে, সামবিধান ব্রাহ্মণ অংশের তৃতীয় মণ্ডল, অষ্টম অনুবাকের দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, 'ওঁ রাত্রিঃ প্রপদ্যে পুনর্ভুং ময়োভুং কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীমাদিত্যঃ শ্রীচক্ষুষে বাস্তঃ প্রাণায় সোমো গন্ধায় আপঃ স্নেহায় মনঃ অনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরম অর্থাৎ যে ব্রহ্মরূপা মহামায়া বারবার অসুরবধের জন্য আবির্ভূত হন, যিনি প্রাণীগণের সুখদাত্রী ও কন্যারূপিনী, যিনি শিখণ্ডিনী অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছভূষণা এবং অসুরবধার্থ পাশহস্তা এবং যিনি নিত্য বাল্য ও বার্ধক্যাবস্থা-রহিতা ও কুমারী প্রভৃতি শক্তিসমূহের সমষ্টিভূতা, সেই রাত্রিরূপা দেবীর শরণাপন্ন হই। তাঁর প্রভাবে সূর্য চক্ষুদ্বয়কে শ্রীযুক্ত করে রক্ষা করুন; বায়ুদেবতা পঞ্চ-প্রাণ রক্ষা করুন; সোমদেব ঘ্রাণেন্দ্রিয় রক্ষা করুন, বরুণদেব সকল তরল পদার্থ রক্ষা করুন ; চন্দ্রদেব আমার মন রক্ষা করুন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমার

বঙ্গে দুর্গাপূজা শুরুর প্রথম দিকে হিন্দুসমাজের সম্ভ্রান্ত অংশেই এই পূজা সীমিত ছিল। প্রথমদিকে মধ্যযুগে, মুসলিম আক্রমণ এবং তাঁদের কাছে পরাজিত হবার অসহ্যতাজনিত ক্রোধ ও বিদেশীদের থেকে স্বাধীন হবার আকুতি প্রকাশের চেষ্টা করতেন দুর্গাপূজা ও কালীপূজার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে মূলত প্রতিপত্তিশালী জমিদার শ্রেণীই এই পূজার অনুষ্ঠান করত। এই বাবু শ্রেণী প্রচুর জাঁকজমকপূর্ণ সমারোহের মাধ্যমে তাঁদের আভিজাত্য প্রকাশ করতে চাইত এই পূজার মাধ্যমে।

শরীর রক্ষা করুন। এই রাত্রিসুক্তে যে দেবীর কল্পনা করা হয়েছে তিনিই দেবী দুর্গার আদি রূপ। আবার পঞ্চদশ শতকে কৃতিবাস ওঝা তাঁর শ্রীরাম পাঁচালী বা কৃতিবাসী রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন করে শরৎকালে দুর্গাপূজা করার কথা উল্লেখ করেন। দুর্গাপূজার মন্ত্রে বলা হয়েছে, “রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী।” যদিও মূল রামায়ণে শরৎকালে দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। ওই পঞ্চদশ শতকেই, ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার তাহেরপুরের জমিদার, রাজা কংসনারায়ণ প্রথম শ্রীরাম পাঁচালীর বর্ণনা অনুযায়ী শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। তাঁর এক পূর্বপুরুষ, কামদেব, ওই অঞ্চলের জমিদার তাহির খাঁকে পদচ্যুত করে জমিদারী লাভ করেন। কামদেব ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই জমিদারী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার ছিলেন রাজা হরিনারায়ণের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ। কথিত আছে, কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে খুব জাঁকজমক সহ বাংলায় প্রথম বর্তমান ধারার দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত ওই মন্দিরলিপিতেও এ কথার সাক্ষ্য মেলে। রাজা কংসনারায়ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তিনি তাঁদের রাজ পুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর কাছে তিনি রাজসূয় যজ্ঞ বা ওই ধরনের কোন অনুষ্ঠান করতে অনুমতি চাইলে শাস্ত্রী মহোদয় তাঁকে দুর্গাপূজার বিধান দেন কারণ কলিযুগে কোন অধীনস্থ রাজা বা জমিদারের পক্ষে এটাই উত্তম পন্থা। পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা কংসনারায়ণ ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। এই দুর্গাপূজা তিনি কবি কৃতিবাসের বর্ণনা অনুযায়ী শরৎকালে করেন। রাজা রামচন্দ্র লঙ্কারাজ রাবণ বধকল্পে শরৎকালেই দেবী দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন। রাজা কংসনারায়ণকৃত শরৎকালের এই দুর্গাপূজাই সময়ান্তরে সমগ্রবঙ্গের হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়। দেবীর এই অকালবোধন এবং শরৎকালে বাংলায় দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' তে বলা হয়েছে, '১৫৮০ খ্রিঃ মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিমায় দুর্গা পূজা করেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী কুল্লুকভট্টের পিতা রাজা উদয়নারায়ণকে উক্ত দুর্গোৎসব করিতে পরামর্শ দেন। ষোড়শ



শতাব্দী হইতে অদ্যাবধি প্রতিমায় দুর্গাপূজা বঙ্গদেশে বাড়িয়া চলিতেছে।' এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও উদ্বোধন প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতে' ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের কথা বলা হয়েছে, তাহেরপুরের মন্দিরলিপি এবং অন্যত্র ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দই উল্লিখিত হয়েছে। এই পূজার সাল হিসেবে এ ছাড়াও তাহেরপুরের প্রথম দুর্গাপূজার সপক্ষে অনেক তথ্যাবলি রয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন, ঐতিহ্যমণ্ডিত তাহেরপুরের দুর্গামন্দিরকে বাংলাদেশের 'জাতীয় মন্দির' হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন জানিয়েছে। এ ঘটনাও প্রমাণ করে, তাহেরপুরই সমগ্র অভিজাত বাংলার প্রথম দুর্গাপূজার মন্দিরস্থল। সুলতানি আমলে বঙ্গে দুর্গাপূজা শুরু হওয়া প্রসঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক গবেষক বলেছেন যে, যোদ্ধার দেবী দুর্গা ও তাঁর আরও ভয়ংকর কালীরূপের আরাধনা বঙ্গে মুসলিম আক্রমণ এবং তাঁদের বঙ্গবিজয়ের সময় এবং তার পরে শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সাম্রাজ্যবাদী মোঘল শক্তি সম্প্রসারণের প্রবল বিরোধী রাজা প্রতাপাদিত্য কালী উপাসক ছিলেন। এর কারণ হিন্দু রাজশক্তি ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী মুসলিম বিজয়ের সাথে সাথে বাংলার প্রান্তিক শক্তিতে পরিনত হয় নিজের স্বভূমিতেই। ফলে যুদ্ধের দেবী দুর্গা আরাধনাতাই তাঁরা নিজস্ব 'পরিচিতি' (identity) খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। তাঁরা তাঁদের ক্ষোভ, ক্রোধ এভাবেই দেবী দুর্গা ও কালীমূর্তির মধ্যে প্রকাশ করেছেন। যাইহোক, তাহেরপুরের পরে আমরা পাই কুচবিহারের রাজপরিবারের দুর্গাপূজার কথা। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিশ্ব সিংহ তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'দুর্গাবাড়ি' বা 'দেবী বাড়ি' মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। আবার কারো কারো মতে, দিনাজপুর ও মালদহের জমিদারগণ প্রথম দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। এর পরে যে উল্লেখযোগ্য দুর্গাপূজার কথা আমরা জানতে পারি সেটা হল বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজা। ওই পরিবারের লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের আটচালা বাড়ি দুর্গামন্দিরে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম তাঁদের পারিবারিক দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন। এই পূজা বাংলার অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপূজা। এছাড়া আন্দুলের দত্তচৌধুরী জমিদার পরিবারের দুর্গাপূজাও খুব প্রাচীন পূজা। এই পরিবারের কালীশ্বর দত্তচৌধুরী ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই



জানবাজারে রানী রাসমণির বাড়ির প্রাচীন দুর্গাপূজা।

পরিবারের প্রবীণ কেউ কেউ দাবি করেন, তাঁদের পরিবারের তেঁকড়ি বা তিনকড়ি দত্ত পঞ্চদশ শতকেই দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রভাবে এই পরিবারের কৃষ্ণানন্দ দত্ত বৈষ্ণব মতাবলম্বী হলে তাঁদের পূজায় বলিপ্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

তবে যিনিই দুর্গাপূজা প্রথম প্রচলন করে থাকুন, এই পূজা যে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগেই বাংলায় প্রবর্তিত হয়েছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নাই।

বঙ্গে দুর্গাপূজা শুরুর প্রথম দিকে হিন্দুসমাজের সম্ভ্রান্ত অংশেই এই পূজা সীমিত ছিল। প্রথমদিকে মধ্যযুগে, মুসলিম আক্রমণ এবং তাঁদের কাছে পরাজিত হবার অসহ্যতাজনিত ক্রোধ ও বিদেশীদের থেকে স্বাধীন হবার আকুতি প্রকাশের চেষ্টা করতেন দুর্গাপূজা ও কালীপূজার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে মূলত প্রতিপত্তিশালী জমিদার শ্রেণীই এই পূজার অনুষ্ঠান করত। এই বাবু শ্রেণী প্রচুর জাঁকজমকপূর্ণ

সমারোহের মাধ্যমে তাঁদের অভিজাত্য প্রকাশ করতে চাইত। এই পূজার মাধ্যমে পরবর্তীকালে, এদেশে ইংরাজ রাজত্ব প্রসারের ফলে এক নতুন ব্যবসায়ী ও জমিদারশ্রেণীর আবির্ভাব হয়। ইংরাজ রাজত্বের শুরু থেকেই এই নতুন শ্রেণীর সাথে ব্যবসাবানিজ্য ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এঁরা কলকাতার 'বাবু' সমাজের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। এঁরা দেশের নতুন রাজা, ইংরাজদের তাঁদের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এই অংশের মধ্যমণি ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। লর্ড ক্লাইভের আনুকূল্যে ও বদান্যতায় তাঁরা অতি জাঁকজমকের সাথে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজা

অনুষ্ঠান করেন। তাঁদের ওই পূজায় নানা অহিন্দুসুলভ বিষয়ও ঢুকে পড়ে ক্লাইভ ও অন্যান্য ইংরাজদের তুষ্ট করার চেষ্টায়; সেখানে বাইজী নাচের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ওই একই বৎসরে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও দুর্গাপূজা শুরু করেন। তাঁর পুজোতেও ইংরাজদের আনাগোনা ছিল। এছাড়া জানবাজারের রানী রাসমণির বাড়ির দুর্গাপূজাও খুব খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু তাঁর বাড়িতে দেশীয় আচারেই পূজা অনুষ্ঠিত হত, সেখানে ইংরাজদের আনাগোনা ছিল না। শোভাবাজার, কৃষ্ণনগর এবং রানী রাসমণির জানবাজারের বাড়িতে আজও অবিস্মরণীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে দুর্গাপূজা। তবে এগুলির কোনটিই বাংলার প্রথম দুর্গাপূজা নয়। তাঁরাও সেটা দাবি



করেননি। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর ইতিহাস, 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' বা শোভাবাজার রাজবাড়ীর ইতিহাসদ্বয়, 'শব্দকল্পদ্রুম' বা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের 'কলকাতার ইতিহাস' ইত্যাদি কোন গ্রন্থেই কিন্তু তাঁদের পরিবারের পুজোকে বাংলার প্রথম দুর্গাপূজা বলে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যদিকে দুর্গাচন্দ্র সান্যাল সহ অন্যান্যদের লেখা 'বাংলার সামাজিক' ইতিহাসে এ বিষয়ে অনেক তথ্য উল্লিখিত আছে। এই দুটি পূজার প্রায় পনের বৎসর আগেই, মারাঠারাজ রঘুজী ভৌসলের মন্ত্রী ও সেনাপতি ভাস্কররাম কোলহাটকর (পণ্ডিত) বাংলায় চৌখ আদায় করতে এসে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে দাঁইহাটে বঙ্গীয় প্রথমতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই পূজাও ১৭৫৭ সালের প্রায় ১৫ বৎসর আগের ঘটনা। এছাড়াও প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি বর্ণনা করেছেন। মিথিলার প্রসিদ্ধ স্মার্তপণ্ডিত বাচস্পতি(১৪২৫-১৪৮০) তাঁর ক্রিয়াচিন্তামণি এবং 'বাসন্তী-পূজাপ্রকরণ' পুস্তকদুটিতে দুর্গার মূম্বয়ী প্রতিমার পূজাপদ্ধতির বর্ণনা করেছেন। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিও তাঁর 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' গ্রন্থে ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে মূম্বয়ী দেবীর পূজাপদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে, বঙ্গ প্রতীমায় দুর্গাপূজা হাজার বৎসরের বেশী প্রাচীন। একসময়ে বাংলার ধনী গৃহস্থের বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ থাকতই। নবদ্বীপে মুকুন্দ সঞ্জয় পুন্যবস্তের চণ্ডীমণ্ডপে চৈতন্যদেব টোল খুলেছিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু খড়দহে নিজের বাড়িতে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করতেন। এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, অনেককাল আগে থেকেই বাংলায় মূর্তিতে দুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল।

যাইহোক, এই দুর্গাপূজা কিন্তু একসময় জমিদারদের ঠাকুরদালান বা অভিজাত বাবুশ্রেণীর নাটমন্দিরের বাইরে অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। কথিত আছে, গুপ্তিপাড়ার কিছু যুবককে এক গৃহস্থের পূজাতে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তৎকালীন হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার ওই যুবকদের মধ্যকার বারোজন ব্রাহ্মণযুবক বন্ধুরা মিলে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে এসে দুর্গাপূজা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁদের প্রতিবেশীরা এতে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু ওই বারোজন যুবক প্রতিবেশীদের সন্দেহকে গুরুত্ব না দিয়ে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন। বারোজন ইয়ার বা বন্ধু মিলে করেছিল বলে ওই পূজা 'বার-ইয়ারী' বা 'বারোয়ারী' পূজা নামে খ্যাত হয়। সাম্প্রতিককালে 'বারোয়ারী' শব্দটির পরিবর্তে 'সার্বজনীন' কথাটি বেশী প্রচলিত হয়ে পড়েছে, যদিও আমরা কম বয়সে 'বারোয়ারী' কথাটিই বেশী শুনতাম। ইতিহাস ও নাট্য গবেষক এবং কাশিমবাজার রাজ পরিবারের সদস্য ডঃ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর প্রকাশিত 'দুর্গাপূজাঃ এ র্যশন্যাল আ প্ৰেপ্রাচ' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, তাঁর পূর্বপুরুষ, রাজা কৃষ্ণনাথের পিতা, রাজা হরিনাথ রায় তাঁদের কাশিমবাজার রাজবাড়িতে ১৮২৪ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ অবধি দুর্গাপূজা করেছেন এবং তিনিই কলকাতায় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে 'বারোয়ারী' দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। ধীরে ধীরে

'বারোয়ারী' কথাটির স্থলে 'সার্বজনীন' কথাটি প্রচলিত হয় সেটা আগেই বলেছি। সার্বজনীন কথাটি কলকাতায় প্রথম ব্যবহার করে সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা। বাগবাজারে তাঁদের ওই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। সর্বসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেই ওই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজার সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও জড়িত ছিলেন। ১৮ শতকের জমিদারী আভিজাত্য আর নব্য ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর দুর্গাপূজা বিংশ শতাব্দীতে এসে স্বাধীনতাকামী, জাতীয়তাবোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। দুর্গাপূজাকে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। দুর্গাদেবীকে শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করতেন তাঁরা। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ সালে লেখা তাঁর 'আনন্দমঠে' দুর্গাকে 'দেবজ্ঞানী' হিসেবে চিত্রিত করলেন। তিনি দেখালেন 'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন।' মা দুর্গার বন্দনায় ধ্বনিত হল 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন 'ভবানী মন্দির' আর 'দুর্গাস্তোত্র'। জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করতে সার্বজনীন পূজা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল সেই পরাধীন দেশেই। ১৯০৫ সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিংস ধারার গুপ্ত সংগঠনের, 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তরের' এর হাজার হাজার যুবকের 'জীবন মৃত্যু কে পায়ের ভূতা' করা প্রেরণার উৎস ছিলেন অসুরনাশিনী মা দুর্গা। মৃত্যুকে তুচ্ছ করা এইসকল অজেয় বীর বিপ্লবীরা মা দুর্গা অথবা কালী মূর্তির সামনে আত্ম বলিদান শপথ গ্রহণ করতেন। ১৯০৩ সালের ৩ অক্টোবর 'Bengalee' পত্রিকায় পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখা হল, 'দুর্গা মূর্তি আমাদের ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীক, তিনি যা আছেন তা নয়, তিনি যা হইবেন তাহার প্রতীক।' সেখানে লেখা হল, 'Nothing Bideshi, Everything Swadeshi.'। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলিতে তিনি মূর্ত হয়ে উঠলেন 'দেবজ্ঞানী'। 'ভারতমাতারূপে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় জেলেই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। তিনি তাঁর মাতৃসমা দেশবন্ধুজায়া বাসন্তী দেবীকে ২৫/০৯/১৯২৫ এর এক চিঠিতে লিখলেন, “আজ মহাষ্টমী। আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এইখানেই শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিতেছি। মা বোধহয় আমাদের কথা ভোলেন নাই, তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা-অর্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে”। স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের কাছে দেবী দুর্গা হয়ে উঠলেন ত্যাগ, তিতিক্ষা আর দেশভক্তির মূল আরাধ্যা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে দুর্গা 'কন্যারূপী' উমা; আবার তিনিই ভয়হারিণী, শক্তিরূপিনী-অসুর-দলনী-অভয়দাত্রী-দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা। তিনি আমাদের মধ্যে অসুরবিনাশী শক্তিরূপে বিরাজিত। কাল থেকে কালান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে তিনি আছেন আমাদের অন্তরে।





বেলুড় মঠে সনাতনী দুর্গাপূজা

পুলক নারায়ণ ধর

স্বামীজীর বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করার বিষয়ে একটি কাহিনী শোনা যায়। জনৈক সন্ন্যাসী ভ্রাতার এক স্বপ্ন দর্শন হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন সাক্ষাৎ দশভূজা, দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে বেলুড় মঠের দিকে আসছেন। গুরু ভ্রাতার মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে স্বামীজি উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে রূপেই হোক এবার মঠে পূজো করতেই হবে।

বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার সূচনা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮ অক্টোবর ১৯০১ সাল। ঐ দিন মার বোধন হয়। স্বামীজি শ্রীশ্রী সারদা মাকে "জ্যোন্ত দুর্গা" রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রী মা ছিলেন শক্তিরূপিনী। স্বামীজি শক্তির পূজারী ছিলেন। দুর্গা কালী তার কাছে একই শক্তির প্রকাশ। বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজায় স্বয়ং শ্রী শ্রী মা উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজি বা অন্যান্য সাধু সন্তরা এই পূজার সংকল্প ধারণের অধিকারী ছিলেন না কারণ সন্ন্যাসীদের সেই অধিকার নেই। তাই শ্রী শ্রী মা স্বয়ং স্বয়ংকল্প ধারণ করেছিলেন। সেই থেকে শ্রী শ্রী মায়ের নামেই ১২৬ বছর ধরে সেই ধারাতেই এখনো দুর্গাপূজা বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বেলুড় মঠ সম্পর্কে স্থানীয় মানুষদের এবং অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু ধারণা সে সময় পরিষ্কার ছিল না। তারা ধারণা করেছিলেন যে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা প্রকৃত হিন্দু নন। তারা হিন্দুদের নৈমিত্তিক পূজা অর্চনা পালন করেন না। তাদের চলাফেরা বা কথাবার্তাও স্থানীয়রা বুঝতে পারতেন না। অনেক সময় স্বামীজিদের নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে

স্বামীজি বেলুড় মঠে দুর্গা পূজার প্রবর্তন করেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব অনুসরণ করে স্বামীজি নিষ্ঠার সঙ্গে এই পূজার সূচনা করেন। অতীব নিষ্ঠা ও বিধিবদ্ধ আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার প্রবর্তন হলো বেলুড়মঠে। তা দেখে বেলুড় মঠ ও স্বামীজিদের প্রসঙ্গে স্থানীয়দের ভ্রান্ত ধারণা দূর হলো।

স্বামীজি তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন "আমি শাস্ত্র মর্যাদা নষ্ট করতে আসিনি পূর্ণ করতে এসেছি" (I have come to fulfil and not to destroy)। পরবর্তীকালে তিনি লক্ষ্মী পূজা ও কালী পূজার আয়োজন করেছিলেন। স্বামীজীর বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করার বিষয়ে একটি কাহিনী ও শোনা যায়। জনৈক সন্ন্যাসী ভ্রাতার এক স্বপ্ন দর্শন হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন সাক্ষাৎ দশভূজা, দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে বেলুড় মঠের দিকে আসছেন। গুরু ভ্রাতার মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে স্বামীজি উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে রূপেই হোক এবার মঠে পূজো করতেই হবে। তখন আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি। কিন্তু স্বামীজীর কথায়





বেলুড় মঠের কুমারী পূজা।

মঠের সন্ন্যাসীদের উৎসাহ সৃষ্টি হল। তাঁরা সবাই কর্মযজ্ঞে নেমে পড়লেন। কলকাতার কুমোরটুলিতে প্রতিমার বায়না করতে চলে গেলেন। আবার একজন সন্ন্যাসী বাগবাজারে শ্রী মার কাছে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করার অনুমতি আনতে গেলেন। সৌভাগ্য এই যে বায়না করতে দেরি হওয়া সত্ত্বেও কুমোরটুলিতে একটি প্রতিমা পাওয়া গেল। বাগবাজারে মায়ের অনুমতি ও মিললা হৈ হৈ করে দুর্গাপূজা করার সীমাহীন আনন্দে বেলুড় মঠ ভেসে গেল। দুর্গাপূজায় পশু বলিদান করা হবে কিনা এই নিয়ে একটা কথা উঠেছিল। কিন্তু পশু বলিদান বিষয়ে শ্রীশ্রীমার আপত্তি ছিল। তাই ফলমূল এসব দিয়েই বলির প্রথা পালন করতে হয়েছে। স্বামীজি ছিলেন বীরের পূজারী। তিনি বলেছিলেন "মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা করতে হয় তবেই তিনি প্রসন্ন হন। মার ছেলে বীর হবে মহাবীর হবে। নিরানন্দে দুঃখে প্রলয়ে মহালয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।" স্বামীজীর দুর্গাপূজার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ও বাংলার সন্তানরা রঘুবীরের মতন বীর হবে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ওপর ভার পড়েছিল পূজার উপকরণ সংগ্রহের। পূজার আসনে বসেছিলেন একজন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল। আর তন্ত্রধারক হয়েছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য। বেলুড় মঠের পাশেই একটি বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল। সেই বাড়িতে এসেছিলেন শ্রী শ্রী মা। তিনি এসেছিলেন বোধনের আগের দিন। বহু গৃহিভক্ত এবং আশেপাশের মানুষজন নিবন্ধিত হয়েছিলেন। মঠে উৎসবের হাট বসে গিয়েছিল। কেমন ছিল সেদিনের দুর্গাপূজা? এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী বলেছেন "মহাসমারোহে তিন দিন ব্যাপী মহোৎসব কল্লোলে মঠ মুখরিত হইল। নববতের সুললিত তান তরঙ্গ গঙ্গার পর পারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

"দীয়াতাং নীয়াতাং ভূজ্যতাম" কথা ব্যতীত মঠস্থ সন্ন্যাসীগণের মুখে এ তিন দিন আর কোনো কথা শুনতে পাওয়া যায় নাই। দিনত্রয়ব্যাপী পূজা নির্বিল্পে সম্পন্ন হইল। গরিব দুঃখীর ভোজন তৃপ্তি সূচক কলরবে মঠ তিন দিন পরিপূর্ণ হইল।"

কুমারী পূজা বেলুড় মঠের একটি প্রধান অঙ্গ। স্বামীজী ৯ জন বিভিন্ন বয়সের কুমারী কে নিয়ে জ্যোন্ত দুর্গা রূপে পূজা করেছিলেন। মহাষ্টমীর দিন এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কুমারী পূজা এসেছে তান্ত্রিক মত থেকে। মনে করা হয় দেবী দুর্গা স্বয়ংসম্পূর্ণ না। অসুর নিধনের জন্য দেবতাগণের পুঞ্জিভূত তেজ থেকেই মা দুর্গার জন্ম। এই কারণে মা দুর্গাকে মনে করা হয় স্বয়ংসিদ্ধা। বৃহৎ ধর্ম পুরাণের মতে দেবী চণ্ডিকা কুমারী কন্যা রূপে দেবতাদের সামনে আবিভূত হয়েছিলেন। তন্ত্রসারে আছে এক থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত বালিকাদের কুমারী পূজার জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। কুমারীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় এক বছরের কন্যা হয় সন্ধ্যা, ২ বছরের কন্যা সরস্বতী, ৩ বছরের ত্রিধামূর্তি ৪ বছরের কালিকা, ৯ বছরের কুমারী কালসন্দর্ভা, ১০ বছরের অপরাজিতা, ১১ বছরের রুদ্রানী, ১২ বছরের ভৈরবী ১৩ বছরের মহালক্ষ্মী ১৪ বছরের পিঠানায়িকা এবং ১৬ বছরের কুমারীর নাম অম্বিকা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কুমারী কে ভগবতীর অংশ বলেছেন। শ্রীবাস সারদা দেবীকে তিনি ষোড়শী রূপে পূজা করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন মাতৃভাব বড় শুদ্ধ ভাব। কুমারীর মধ্যে দৈবিকভাবে প্রকাশ দেখা বা তাকে জননীরূপে পূজা করা সেই ভাবেরই এক সার্থক প্রকাশ। তাই কুমারী পূজা শাস্ত্রবিদিত এবং একটি পবিত্র পূজার অঙ্গ। স্বামীজি কিন্তু বেলুড় মঠে একবারই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন প্রথম ও শেষবার সেই ১৯০১



সালো কারণ স্বামীজি এরপর বেশিদিন দেহ ধারণ করেননি। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তিনি এই ধাম পরিত্যাগ করেন।

স্বামীজির দেহাবসানের পর পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী প্রেমানন্দজী (বাবুরাম) মহারাজ। সে সময় অনেকবারই মূর্তিতে পূজা না হয়ে অনিবার্য কারণে ঘটে ও পটে পূজা হয়েছিল। ১৯১২ সালে মহা উৎসাহে শ্রী মাকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসা হয়েছিল। তিনি সেবার বেলুড়ে ৬ দিন ছিলেন। ১৯২০ সালে শ্রীশ্রী মায়ের দেহাবসানের পরও তাঁর নামেই পূজার সঙ্কল্প হয়ে আসছে। এটাই বিশ্বাস যে তিনি সুক্ষ্ম দেহে উপস্থিত থাকেন। এটা বেলুড় মঠের পূজার একটি বৈশিষ্ট্য যে প্রতিমা নিরঞ্জনর পর কাঠামোটি রক্ষা করা হয়। সেই কাঠামোর ওপরেই আবার প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পূজা করা হয়। বেলুড় মঠের নতুন প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। বেলুড় মঠে প্রতিমা নির্মাণ থেকে শুরু করে পূজা এবং নিরঞ্জন সমস্তই অনুষ্ঠিত হয় পুরনো ঐতিহ্য অনুসারে। তবে বর্তমান সময়ে লক্ষ্য করা যায় লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম। তাদের উৎসাহের প্রাবল্যে পূজা প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে। তাদের সেবা যত্ন করা প্রসার বিতরণ করা আগেকার কাল থেকে অনেক কঠিন। এই পূজার জন্য সাধারণ ভক্ত এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। আজও সেদিনের মতন বহু বিদেশী এই পূজা প্রাঙ্গণে ভিড় করে।

দুর্গা মায়ের স্নানের অভিষেকের জন্য যে জল আনা হয় সে এক মহাসমারোহ। ভুবনেশ্বরের বিন্দু সরোবরের জল সংগ্রহ করে মা'র স্নানভিষেক করান হয়। শুধু তাই নয়, জল সংগ্রহ হয় আরো বহু জায়গা থেকে ব্রহ্মপুত্র নদীর জল, গঙ্গাজল, শিশির জল, সুগন্ধি জল, স্বর্ণ জল, রৌপ্য জল, প্রভৃতিতেও দেবীকে অভিষেক করা হয়। নানা জায়গার মাটি সংগ্রহ করা হয়। এইসব মাটির পুরানে উল্লেখ পাওয়া যায়। তা হচ্ছে গজদন্ত মৃত্তিকা, গঙ্গা মৃত্তিকা, নদ নদী সাগরের মৃত্তিকা, বৃষ শৃঙ্গ মৃত্তিকা, বেশ্যা দ্বার মৃত্তিকা, বল্লীক মৃত্তিকা, পর্বত মৃত্তিকা, অশ্বদন্ত মৃত্তিকা প্রভৃতি।

বেলুড় মঠের ঢাক ঢোল যারা বাজান তারা ৮০ বছর ধরে এখনো আসছেন। এরা পঞ্চানন হাজারার বংশধর। দেবীর বোধনের দিন থেকেই সারা মঠ সানাইয়ের সুরে মথিত হয়ে যায়। বেলুড় মঠের কাছেই জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে। সেই মন্দির থেকে শালগ্রাম শিলা মঠে আনা হয়। পঞ্চমী তিথিতে দেবী পূজার সময় পূজা হয়। আবার দশমীর পর ঢাকঢোল ঘন্টা নিয়ে সেই শিলা জগন্নাথ দেবের মন্দিরে রেখে আসা হয়। মায়ের মন্দিরে রোজ যে শিবলিঙ্গ পূজিত হয় তাকেও পূজার সময় নিয়ে আসা হয় পূজা মন্ডপে। মায়ের ঘাটে নবপত্রিকা স্নান করানো হয়, সপ্তমীর দিন সকালে।

দশমীর দিন সকল ভক্ত ও মায়ের ছেলেমেয়েদের চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে, মাকে এবার বিদায় দিতে হবে। মায়ের ঘাটে দেবী মূর্তিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের যে প্রস্তুতি এতদিনের যে আনন্দ তা সীমিত হয়ে আসে। শান্ত মঠে ফিরে আসে। শান্তি জল সিঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে শান্তির আবহ।

তব্ধে ও পুরাণে কালী ও দুর্গাকে আদ্যা শক্তির প্রকাশ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তির পূজারী। তাঁর হৃদয়ে ছিল অপার ভক্তি। তাই এই শক্তির পূজা স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষ এই শক্তিতে জাগরিত হোক। আধ্যাত্মিক শক্তি এবং দেশপ্রেম এই দুই ছিল স্বামীজির মূল মন্ত্র। তাই দুর্গাপূজা থেকে স্বামীজীর ভাবনাকে পৃথক করা যায় না। এই পূজা তাই বাইরের কোন অনুষ্ঠান নয়। এই পূজা অন্তরের জাগরণের অনুষ্ঠান। মা তাই চিন্ময়ী রূপে আমাদের সবার অন্তরে বিরাজিত। আমাদের অন্তরের মন্ত্র "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতাঃ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ"।

সূত্র: বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা। স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ।
ছবি ঋণঃ বেলুড় মঠ ও মিশন।



বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় ভক্ত সমাবেশ।



দুর্গাপূজাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের সম্মান নরেন্দ্র মোদীর সরকারই এনে দিয়েছে



অভিরূপ ঘোষ

রাজনৈতিক পালাবদলের উর্ধ্বে উঠে সত্যি এটাই যে, দুর্গাপূজাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ করার কৃতিত্ব এক এবং একমাত্র বিজেপির। স্বাধীনতার পর তৃণমূলের সমর্থনেও কংগ্রেস সরকার তৈরি হয়েছে, আবার সিপিএমের সমর্থনেও কংগ্রেস সরকার চলেছে। কিন্তু তারা কেউই কোনোদিন দুর্গাপূজাকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে তুলে ধরার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। করেছে শুধু নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সরকার।

সাল ২০২১। ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে চলছে এক মহাগুরুত্বপূর্ণ মিটিং। সেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারি লিলি পাভো। এক মহাগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপিয়ে প্যারিস পাঠানো হয়েছে ভারত সরকারের তরফ থেকে। তিনি জানেন, তাঁকে সেই দায়িত্ব পূর্ণ করেই দেশে ফিরতে হবে, কারণ এটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন। সব থেকে বড় কথা, এই লড়াই শুধু ডিপ্লোমেসির যুদ্ধ নয়; এই লড়াই গোটা বিশ্বকে ভারতের সংস্কৃতি চিনিয়ে দেওয়ার লড়াই।

তিনি বলতে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠে ১৩০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্ন আর হাতে এক ব্রহ্মাস্ত্র। বিশিষ্ট অধ্যাপিকা তপতী গুহ ঠাকুরতা শেষ তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরি করেছিলেন এক দুর্লভ তথ্যভান্ডার আর যুক্তির মহাসমুদ্র। আপাতত সেটাকেই গোটা বিশ্বের সামনে চিনিয়ে দিতে হবে ভারত সরকারের অভিজ্ঞ আমলাকে।

প্যারিস থেকে ৭৮৫০ কিলোমিটার দূরে কলকাতায় তখন ভয়াবহ দুঃসময়। হাজার হাজার কর্মী ঘরছাড়া গোটা রাজ্যে। খুন হয়ে গেছেন অনেকে। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, তৎকালীন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, তৎকালীন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ—সহ সকলেই তখন গোটা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন কর্মীদের পাশে থাকতো সেদিন তাঁরা সিঙ্গুরে। চাষীদের দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজার হাজার প্রতিশ্রুতির একটিও পূরণ না করার বিরুদ্ধে তিনজনে একসঙ্গে পথে নেমেছেন সেদিন। ঘটনাচক্রে সেদিনই শুভেন্দু বাবুর জন্মদিন। কিন্তু আর পাঁচজন বিজেপি কার্যকর্তার মতো তিনিও ঘটা করে নিজের জন্মদিন পালনের চেয়ে মানুষের পাশে থাকাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে

করেছেন। তাই সিঙ্গুরের কার্যক্রম শেষ হতে না হতেই তিনি দৌড়ে এসেছেন কলকাতায়—পৌরসভা নির্বাচনের প্রচারে।

ঠিক তখনই এল সুখবর।

এ সুখবর আশারই ছিল। আর তাই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ঠিক সেদিনই এগারোটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে গিয়েছিলেন অযোধ্যায়। সন্ধ্যাবেলা তিনি যখন সরযু নদীর ধারে আরতি দেখছেন, তখনই বেজে উঠল ফোনা।

মিশন সাকসেসফুল।

ভারত শুধু নয়, গোটা এশিয়ার প্রথম ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেয়েছে দুর্গাপূজো।

আপাতভাবে সহজ মনে হলেও বড্ড কঠিন ছিল এই যাত্রা। কোনো ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে খুব সহজে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা দিতে চায় না ইউনেস্কো। তবে নরেন্দ্র মোদী অনড় ছিলেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরপরই তিনি উদ্যোগ নিতে আরম্ভ করেন, কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে গোটা বিশ্বের সামনে সগৌরবে তুলে ধরা যায়। দুর্গাপূজো ছিল সেই উদ্যোগের একেবারে প্রথম সারিতে।

আসলে বাঙালি আর তার শ্রেষ্ঠ পূজো বিজেপির খুব আপনা। আর তাই দীর্ঘ বছর বছর ধরে দুর্গাপূজার সময় রীতিমতো উপবাস করে কৃচ্ছসাধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। আর তাই আন্তর্জাতিক নেতা এবং রাষ্ট্রপ্রধানরা ভারতে এলে তাঁদের হাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঙ্গে মা দুর্গার প্রতিকৃতি তুলে দেওয়া হয়। আর তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকার শপথ নেওয়ার সময় মঞ্চের পিছনে কোনো রাজনৈতিক ছবি থাকে না—থাকেন স্বয়ং মা কালী এবং মা দুর্গা।

দুর্ভাগ্য বাঙালির, মাতৃরূপেণ মা দুর্গাকেও রাজনীতির ঘুঁটি বানাতে





মহাষ্টমীর পূর্ণক্ষেণে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে মা দুর্গার পূজায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। নয়াদিল্লি, ২০২৫।



সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে মা দুর্গার পূজায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। সঙ্গে শ্রী গুভেন্দু অধিকারী ও শ্রী শমীক ভট্টাচার্য। কলকাতা, ২০২৫।

পিছপা হয়নি বাম এবং তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঘোষণার পরপরই দুর্গাপূজাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বানানোর রূপকার হিসেবে মমতা ব্যানার্জিকে তুলে ধরতে আরম্ভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। সর্বত্র পোস্টার পড়ে যায়। মিডিয়া জুড়ে তৃণমূল নেতারা বড় বড় ভাষণ দিতে থাকে, মমতা ব্যানার্জির প্রশংসা করে। অন্যদিকে, তৃণমূলের বি-টিম বামেরা লেগে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃতিত্বকে লঘু করে দেখিয়ে বিজেপিকে বাঙালি-বিরোধী প্রমাণ করতে।

কিন্তু বাঙালিকে বোকা বানিয়ে রাখা বাম-তৃণমূলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাঙালি বুঝতে পারে যে, মমতা ব্যানার্জি মহরমের জন্য দুর্গাপূজার বিসর্জন বন্ধ রাখতে পারেন; তিনি আদতে মা দুর্গার উপাসক নন। বাঙালি বুঝতে পারে যে, মমতা ব্যানার্জি মহালয়ার আগেই দুর্গাপূজার উদ্বোধন করতে লেগে পড়েন; তিনি আসলে মা দুর্গাকে একটুও ভক্তি করেন না। বাঙালি এটাও বুঝতে পারে যে, মমতা ব্যানার্জি পাশের দেশে হাজার হাজার দেবী প্রতিমা নষ্ট করার পরেও ভোটব্যাংকের জন্য মুখ খোলেন না; তিনি আসলে সনাতনকে একটুও সম্মান করেন না।

রইল বাকি বামেরা। ধর্মতলায় প্রকাশ্যে গরু খাওয়া বাম উকিল কোর্ট থেকে লিখে এনে দিলেও বাঙালি বিশ্বাস করবে না যে, হিন্দুদের প্রতি বামেদের একটুও সহানুভূতি আছে। বাঙালি তো বটেই, বামেরা নিজেরাও বিশ্বাস করে, তারা তোষণ এবং হিন্দু-বিরোধিতায় চিরদায়বদ্ধ। তাই বামেরা যতই তৃণমূলের হয়ে পরোক্ষ চিৎকার করুক না কেন, বাঙালির এটা বুঝতে দেরি হয়নি যে, বাম-তৃণমূলের অধিকাংশ দাবির মতো দুর্গাপূজাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ করার কৃতিত্ব ছাওয়াটাও আসলে ১০০ শতাংশ মিথ্যা।

সব থেকে বড় কথা, এটাই ইন্টারনেটের যুগ। শিক্ষিত বাঙালির এটা জানতে একটুও কষ্ট করতে হয়নি যে, কোনও একটি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে তুলে ধরার ক্ষমতা শুধুমাত্র দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের থাকে। বাঙালির এটা জানতে একটুও কষ্ট করতে হয়নি যে, স্বাধীনতার পর একটা বিশাল সময় বাম-

তৃণমূলের দোসর কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার পরেও বাঙালির প্রাণপ্রিয় এই পূজাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি তারা।

আজ বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায়। কিন্তু আজ থেকে অনেক বছর আগে শুরু হওয়া এক প্রথা অনুযায়ী, রাজ্য বিজেপির যে পূজো হয়, তা অধিকাংশই মহিলা পরিচালিত। এমনকি মুখ্য পুরোহিত নিজেও একজন মহিলা হন। সিপিএম এবং তাদের দোসর তৃণমূল যখন নারী স্বাধীনতার মিথ্যে বুলি আওড়ায়, তখন বিজেপি 'মাতৃরূপেণ' ও মা দুর্গার পূজায় প্রকৃত মায়েদের কাজে লাগায়।

শেষ কয়েক বছর ধরে বিজেপির বিভিন্ন কর্মকর্তাদের উদ্যোগে যে দুর্গাপূজাগুলি হয়, সেখানে পূজোটাই আসল প্রাধান্য পায়। মা দুর্গার আরাধনা সেখানে মুখ্য, আর উৎসব সেখানে গৌণ। তাই বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বারবার ছুটে আসেন দুর্গাপূজার সময়। তাই দুর্গাপূজার প্রাক্কালে প্রতি বছর রাজ্যের এবং রাজ্য বা দেশের বাইরে থাকা সমস্ত বাঙালির উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী।

আজ থেকে ছয় মাস আগেও বিজেপি ক্ষমতায় ছিল না। ভবিষ্যতে কতদিন বিজেপি ক্ষমতায় থাকবে, সেটা সময় বলবে। তবে রাজনৈতিক পালাবদলের উর্ধ্বে উঠে সত্যি এটাই যে, দুর্গাপূজাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ করার কৃতিত্ব এক এবং একমাত্র বিজেপি। স্বাধীনতার পর তৃণমূলের সমর্থনেও কংগ্রেস সরকার তৈরি হয়েছে, আবার সিপিএমের সমর্থনেও কংগ্রেস সরকার চলেছে। কিন্তু তারা কেউই কোনোদিন দুর্গাপূজাকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে তুলে ধরার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি করেছে। শুধু নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সরকার।

ঠিক যেমন স্বাধীনতার আট দশক পর বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে বিজেপি সরকার, কোনো তৃণমূল বা সিপিএম-সমর্থিত সরকার নয়। আসলে সত্যি এটাই যে, ভারতীয় জনতা পার্টিকে বহিরাগত দল হিসেবে প্রচার করার যাবতীয় চেষ্টা হলেও বাংলা এবং বাঙালিকে সব থেকে আপন যারা মনে করে, সেটা বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপিই, অন্য কেউ নয়। বাকিরা শুধু রাজনৈতিক ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যে নাটক করে মাত্র।





রাজনৈতিক সন্ন্যাসী নরেন্দ্র মোদী

নারায়ণ চক্রবর্তী

১৯৫০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর গুজরাটের মেহসানা জেলার ভদনগরে মূলচাঁদ ও হীরাবেন মোদীর তৃতীয় সন্তান নরেন্দ্রের জন্ম হয়। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে বেড়ে ওঠা এই মানুষটি খুব অল্প বয়সেই হিন্দু আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একাধিকবার পুরোপুরি আধ্যাত্মিকতায় লিপ্ত হতে চেয়েও বিভিন্ন কারনে ব্যর্থ হওয়ার পরেও তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে সমাজসেবামূলক কাজ বেছে নিতে গিয়ে মিশনে সন্ন্যাস নেওয়ার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে যোগ দিয়ে স্বয়ংসেবক হওয়ার পর বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজের আত্মিক শক্তি খুঁজে পেলেন। এই সেবার আর্তিই পরবর্তী সময় ভারতকে তার শ্রেষ্ঠ সেবককে উপহার দিয়েছে।

অদ্ভুত লাগে যে, তাঁর জন্মদিন কিন্তু

জগতের রূপকার বিশ্বকর্মার জন্মদিন। একই দিন ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলি বিশ্বেসরাইয়াজীর জন্মদিনও বটে। ঐ দিন এখনো বিজ্ঞান-ভারতী প্রকৌশলী দিবস হিসেবে পালন করে। ভাবতে অবাক লাগে, একবিংশ শতাব্দীর ভারত নির্মাণের প্রকৌশলী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর জন্মদিনও একই।

প্রায় বছর দুই আগে দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে মোদীজীর সঙ্গে যখন আমার আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছিল, তখন অবাক হয়েছিলাম আমার মত অভাজনের পেশাদারী দক্ষতার বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল জেনে। আমি ওনাকে যখন ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত হবে, তখন উনি এবং আমি, দুজনেই নশ্বর দেহে থাকব না, তাই এই ধারণায় দেশের মধ্যে শুধু নয়, বিদেশের কাছেও তিনি রাষ্ট্রগুরু থেকে

বিশ্বগুরুতে উন্নীত হয়েছেন, বলেছিলাম, তিনি শিশুর মত সলজ্জ হেসে আমার হাত দু হাত দিয়ে ধরে বলেছিলেন, "ভাই, এ্যাসা মত বোলো"। সেদিন উপলব্ধি করেছি, এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাদের মনে কতটা শক্তি জোগায়।

মোদীজীর রাজনৈতিক জীবনের আগের কথা যা বলেছি, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে জানানো, তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষের সেবার জন্য কতটা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আর্তি অনুভব করতেন। রাজনৈতিক জীবনে এখনো পর্যন্ত তাঁর এই আর্তি অটুট আছে।

নিজের জীবনে তিনি একাত্ম মানব দর্শনের প্রয়োগে স্ব-কে উপলব্ধি করেছেন। নিজের শত ব্যস্ততার মধ্যেও মা হীরাবেনকে যখনই সময় পেয়েছেন, তখনই সেবা করেছেন। তাঁর পুরো পরিবার এতটাই



সংস্কারিত ভারতীয় যে, তাঁর দাদা-ভাই বা একমাত্র বোনের জীবন ও জীবিকা বা সম্পত্তির বিষয়ে কেউ আঙ্গুল পর্যন্ত তুলতে পারেনি। ভারতের অন্য সমস্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে এমন কোনো শংসাপত্র দেওয়া যায় কি? এমনকি ২০০১ - ২০১৪ সাল গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং ২০১৪ সাল থেকে টানা দেশের দীর্ঘতম সময় নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী থাকার পরেও তাঁর বা তাঁর পরিবারের কারোর বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ পর্যন্ত ওঠেনি। এমন উদাহরণ শুধু ভারতীয় উপমহাদেশ নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও অশ্রুতপূর্ব।

তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্ব নেওয়ার আগে গুজরাট একটি সাধারণ রাজ্য থাকলেও তাঁর সময় থেকে রাজ্যের উন্নয়নের যে মডেল তৈরী করেন, তা দেশের অন্যান্য রাজ্যের কাছে আজও 'গুজরাট মডেল' হিসেবে আদৃত এবং অনুকরণীয়।

তিনি কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে জলের যোগান ও বন্টনের যে মডেল তৈরী করেন, তার ফল হল, গুজরাটে বার্ষিক উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি। তিনি নর্মদা জল প্রজেক্টের সঙ্গে বিভিন্ন ক্যানাল, বাঁধের পাইপলাইন সংযোগে সেচের জলের সুখম বন্টন ও ব্যবহার করে এমন অসাধ্য সাধন করেন।

অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পে তিনি তিন ফেজে ১৮০০০-এর উপর গ্রামে দিনের ২৪ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করেন। এর পোষাকি নাম 'জ্যোতিগ্রাম যোজনা'। তিনি রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিশেষ করে বিভিন্ন মফস্বল শহর ও হাইওয়ের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবকাঠামো তৈরীর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেন।

তিনি 'শলা প্রবেশোৎসব' ও 'কন্যা কলাবনী' নামের নারী শিক্ষার টাগেট নির্ভর বিভিন্ন স্কিম করে সেখানে বড় ধরনের অর্থ বরাদ্দ রাখেন। আশ্চর্য হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রেও কোনো দুর্নীতির



অভিযোগ নেই। তিনি 'গরীব কল্যান

মেলা'র মাধ্যমে গ্রামীণ গরীবদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রকল্প চালু করেন।

এমনকি আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে State Wide Attention on Grievances by Application of Technology (SWAGAT) চালু করে ২০০৩ সালেই জনতা জনার্দনের সব অভিযোগের সমাধানের জন্য রাজ্য প্রশাসনকে দায়িত্ব দেয়া ফলে, সেখানে জনসাধারণের অভিযোগের সুরাহা হওয়ারও উপায় রাখা হয়। সর্বোপরি 'গুজরাট মডেল'কে সামনে রেখে প্রতি বছর নিয়ম করে শিল্প বাণিজ্যে বিনিয়োগের প্রশ্নে

Vibrant Gujrat Business summit এর আয়োজন করেন। এই মডেল এখন প্রায় সব রাজ্যই অনুসরণ করছে। এভাবে প্রথমে অবকাঠামো উন্নয়ন করে তারপর লগ্নির আমন্ত্রণ তাঁর সুদক্ষ লিডারশিপের পরিচয় বহন করে।

প্রধানমন্ত্রীত্বের ১৪ বছরেও তাঁর নেতৃত্বে দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য কম নয়। কিছু বিশেষ প্রকল্প এবং জাতির পক্ষে অভূতপূর্ব বিষয়না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

প্রথমেই আসে জাতীয় সুরক্ষা ও অখণ্ডতার পক্ষে সবচেয়ে সাহসী ও দৃঢ় পদক্ষেপ - ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ ধারা বিলোপ করে কাশ্মীরসহ সারা ভারতে এক

নিয়ম চালু করা। দেশের সকল রাজ্যে দেশের মানুষের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমান সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অধিকার পাওয়া সুনিশ্চিতকরণ। এর সঙ্গে ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ, দেশের অভ্যন্তরে এবং সীমান্তের বাইরে থেকে, উভয় ক্ষেত্রেই জিরো টলারেন্স নীতি লাগু করা, বিদেশী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় পদক্ষেপ করা এবং অবশ্যই সীমান্ত পার্শ্ববর্তী দেশের থেকে সন্ত্রাস রপ্তানিকারীদের তাদের ঘাঁটিতে ঢুকে ধ্বংস করা (surgical strike)- এসবই মোদীর



নেতৃত্বে দেশের মধ্যে অবস্থান সুদৃঢ় এবং বিদেশে ভারতের সম্মান বাড়িয়েছে।

সমাজকল্যানজনিত প্রকল্পে জোর দিয়ে তাঁর সময় উজ্জ্বলা যোজনায় নিম্নবিত্তদের জন্য ফ্রি রান্নার গ্যাস বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে, জন-ধন-যোজনায় কয়েক কোটি গরীব মানুষের জিরো ব্যালেন্স খাতা খুলে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সামাজিক সুবিধাসহ বিভিন্ন ভাতার অর্থ সরাসরি ভোক্তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া, বিশ্বের বৃহত্তম বীমা প্রকল্প, আয়ুত্মান ভারত, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (সরকারের আর্থিক দায়ভার) দেওয়া, ২০১৪ সালের ২রা আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে শুরু হওয়া স্বচ্ছ ভারত মিশনের মাধ্যমে কোটি কোটি শৌচাগার নির্মাণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে স্বাধীন ভারতে এক বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

যোগাযোগ ও রাস্তা নির্মাণ, বিভিন্ন সংযোগকারী হাইওয়ে নির্মাণ, টোল সিস্টেমের যুক্তিসংগত ও সময় সাশ্রয়কারী পরিবর্তন, বন্দে ভারত সহ বিভিন্ন দ্রুতগতির ট্রেন চালু করে রেল ব্যবস্থার ক্রমঃউন্নতিকরন, বিভিন্ন রাজ্যে ফ্রেট করিডোর ব্যবস্থা, এসব অবকাঠামো নির্মাণের পরেই দ্রুত দেশী-বিদেশী লগিকারীদের আকর্ষণ করে বিনিয়োগ বাড়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে মেক-ইন-ইন্ডিয়ার জোরদার প্রয়োগের একটি সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতীয়ত্বের বোধে জাতীয়তাবোধের নিঃসন্দেহে পুনর্জাগরণ হয়েছে। এর সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে এই বোধ এমনভাবে কাজ করেছে যে ভারত রকেট উৎক্ষেপন, বিশেষ করে চন্দ্র ও মঙ্গল অভিযান এবং পর্যবেক্ষণে বিশ্বের প্রথম সারির উন্নত দেশগুলির কাছে পর্যন্ত ঈশ্বরীয় অবদান রেখেছে। ভারতীয় প্রযুক্তি এবং ভারতীয় সম্পদ ব্যবহারে প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে মোদীজীর অনুপ্রেরণায় দেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। চিকিৎসা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞানে সঠিক বিনিয়োগের ও সঠিক মেধা চয়নে

প্রধানমন্ত্রীজীর পরামর্শে দেশের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লক্ষ্যনীয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোদীজীর নেতৃত্বে বিকশিত ভারত মিশনে স্বাধীন দেশে বৃহত্তম সংস্কার হয়েছে। কর ব্যবস্থার সরলীকরন ও জিএসটি চালু করা। এক দেশ, এক কর নীতি এখন প্রায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে চালু আছে। এই নীতির কারনেই এখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশ ছুঁয়েছে যা আমেরিকা ও চিনের কাছেও ঈশ্বরীয়।



মোদীজীর নিজের উক্তি। "অসামান্য সাফল্য"। সারা দেশের প্রতিটি কোনে UPI ও ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির মতই অর্থনৈতিক লেনদেনের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এই সময়ই এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার এই পদ্ধতি চালুর জন্য আপামর দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শেষে বলি, নরেন্দ্র মোদীজীর সরকারের দৃঢ় অথচ যুক্তিপূর্ণ বিদেশনীতির সফল প্রয়োগে রাষ্ট্রপুঞ্জ, G20, ও BRICS জোট

ভারতের কণ্ঠ ও নেতৃত্ব ভারতের অবস্থানকে আগের চেয়ে অনেক জোরদার করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতের কণ্ঠ অনুরোধের পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবী হিসেবে মান্যতা পাচ্ছে। এই পর্যায়ে ভারতের বিদেশনীতিতে যে paradigm shift হয়েছে, তা হল, দেশের স্বার্থ ও পারস্পরিক স্বার্থে জোটবদ্ধ নীতি যা সময় ও চাহিদার সঙ্গে পরিবর্তনশীল। এই নীতি এতদিন আমেরিকা, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে দেখা গেলেও এখন রাষ্ট্রপুঞ্জের মত মঞ্চে সর্ববৃহৎ জোটশক্তি হিসেবে ভারতের স্থান এই তিন দেশের সঙ্গে মান্যতা পাচ্ছে।

প্রতিবেশী দেশের সীমানা বিরোধের নামে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ভারতের উপর চাপ বৃদ্ধির চেষ্টা এখন ব্যুমেরাং হয়ে তাদেরকেই ক্রমশঃ বিশ্বরাজনীতিতে অপাংক্তেয় করে তুলেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে মর্যাদা দেওয়ার কারনেই নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী আজ বিশ্বগুরু। আপনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং উত্তরোত্তর দেশের জন্য আপনার সর্বাঙ্গীন কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকে প্রণাম।





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাফল্য ও উন্নয়নের নতুন অধ্যায়

গৌতম ঘোষ

উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ তখনই পূর্ণ হয়, যখন তার সুফল পৌঁছে যায় শহর থেকে গ্রাম, পাহাড় থেকে সুন্দরবন, কৃষকের মাঠ থেকে ছাত্রের শ্রেণিকক্ষ, মায়ের ঘর থেকে তরুণের কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের নতুন অধ্যায় তাই শুধু সরকারের নয়—এটি প্রশাসন, শিল্প, কৃষক, শ্রমিক, নারী, ছাত্র-যুব এবং প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত দায়িত্ব ও প্রত্যাশার অধ্যায়।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিসরে সূচিত হয়েছে এক নতুন অধ্যায়। ৪ মে প্রকাশিত নির্বাচন কমিশনের ফল অনুযায়ী, ২৯৩টি ফল ঘোষিত আসনের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি ২০৭টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং যশস্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির ডাকে সাড়া দিয়ে তৃণমূলের ভয়ের বদলে ভারতীয় জনতা পার্টির ভরসাকে বেছে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের জনতা জনার্দনা সরকারে আসার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে একাধিক প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কার্য করে দেখিয়েছে এই সরকার। নতুন সরকারের সামনে তাই প্রত্যাশার চাপও যথেষ্ট।

নির্বাচনের আগে প্রকাশিত বিজেপির 'সঙ্কল্প পত্র'-এ নারীকল্যাণ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামোকে উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এখন মূল প্রশ্ন—ঘোষিত সংকল্পগুলি কত দ্রুত, কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং কতটা কার্যকরভাবে মানুষের জীবনে পৌঁছায়।

এই পরিবর্তনের মূল্যায়ন করতে হলে আবেগের পাশাপাশি প্রয়োজন বাস্তবতার মাপকাঠি। কারণ সরকারের সাফল্য শেষ পর্যন্ত কাগজে লেখা প্রতিশ্রুতিতে নয়, সাধারণ মানুষের জীবনে তার দৃশ্যমান প্রভাবে।

নারীকল্যাণ: সহায়তা থেকে স্বনির্ভরতার দিকে

নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা ও নিরাপত্তাকে নির্বাচনী সঙ্কল্পে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে রয়েছে যোগ্য মহিলাদের মাসিক ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা, প্রায় ৭৫ লক্ষ মহিলাকে 'লাখপতি দিদি' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও স্বনিযুক্তির উদ্যোগ, গর্ভবতী মহিলাদের ২১,০০০ টাকা সহায়তা ও পুষ্টিকিট, বিনামূল্যে HPV টিকাকরণ এবং মহিলাদের সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের পরিকল্পনা। এর সঙ্গে মহিলা পুলিশ স্টেশন এবং 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'-এর মতো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

একজন গৃহবধূর কাছে ৩,০০০ টাকা হয়তো সংসারের বাজারে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা; আবার একজন স্বনির্ভর মহিলার কাছে প্রশিক্ষণ ও ঋণ হতে পারে ছোট ব্যবসা শুরু করার পুঁজি। তাই প্রকৃত সাফল্যের মাপকাঠি হবে—সহায়তা কতজন পেলেন এবং সেই সহায়তা কতজন মহিলাকে দীর্ঘমেয়াদে আয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছে।

কৃষক: মাঠের উৎপাদন থেকে বাজারের ন্যায্যমূল্য

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ কৃষক। সঙ্কল্পপত্রে PM-KISAN-এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত সহায়তা মিলিয়ে



কৃষক পরিবারকে বছরে ৯,০০০ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ধান ৩,১০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দরে সংগ্রহের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। কৃষকের কাছে এই হিসাব শুধু টাকার হিসাব নয়—এটি উৎপাদন খরচ, পরিবারের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং পরবর্তী মরশুমের বীজ-সারের সঙ্গে যুক্ত। একইসঙ্গে সার সরবরাহে স্বচ্ছতা, আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা, কৃষি-সহায়ক পরিকাঠামো এবং পশুপালন ও মৎস্যচাষের উন্নয়ন গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও বহুমুখী করতে পারে।

একজন কৃষকের কথায়, “ফসল ফলানোর পর যদি ভালো দাম না পাই, তাহলে মাঠে পরিশ্রমের হিসাবটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।” এই কথার মধ্যেই কৃষি সংস্কারের আসল চ্যালেঞ্জটি স্পষ্ট।

শিক্ষা: শুধু ডিগ্রি নয়, ভবিষ্যতের দক্ষতা

শিক্ষাক্ষেত্রে ঘোষিত সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য গুণগত মান, স্বচ্ছ নিয়োগ এবং আধুনিক পরিকাঠামো। স্কুলের মিড-ডে মিলের মানোন্নয়নের পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণিত, কোডিং, রোবোটিক্স ও তথ্য বিশ্লেষণের মতো দক্ষতার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে IIT ও AIIMS-এর মতো জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান এবং ঝাড়গ্রামে আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথাও নির্বাচনী ঘোষণায় এসেছে।

একজন গ্রামের ছাত্রের হাতে যদি আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষা পৌঁছে যায়, তাহলে কলকাতার সুযোগ আর গ্রামের সুযোগের মধ্যে দূরত্ব কমতে পারে। তবে এর জন্য শুধু প্রতিষ্ঠান ঘোষণা যথেষ্ট নয়—যোগ্য শিক্ষক, ল্যাবরেটরি, ইন্টারনেট, প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত মূল্যায়নও সমান জরুরি। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে বাজেটে মহার্ঘ ভাতা ১৮ শতাংশ থেকে ৩৮ শতাংশে উন্নীত করার ঘোষণা করা হয়েছে, যা ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক সুরক্ষা জোরদার হবে।

স্বাস্থ্য: শহরের পাশাপাশি প্রান্তিক বাংলাও

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আয়ুত্মান ভারত কার্যকর করা, উত্তরবঙ্গে AIIMS প্রতিষ্ঠা, নারীস্বাস্থ্যে HPV টিকাকরণ ও ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের মতো উদ্যোগের কথা সঙ্কল্পপত্রে রয়েছে। সুন্দরবন ও জঙ্গলমহলের মতো ভৌগোলিকভাবে কঠিন অঞ্চলে উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যন্ত এলাকার একজন রোগীকে শুধু চিকিৎসার জন্য কলকাতায় ছুটতে হলে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সাফল্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শিল্প ও পরিকাঠামো: কর্মসংস্থানের নতুন ভিত্তি

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সিন্ধুরে শিল্প পার্ক, চারটি বৃহৎ শিল্পাঞ্চল, হলদিয়াকে বন্দরভিত্তিক শিল্পাঞ্চল হিসেবে বিকাশ, MSME-কে ঋণ ও বাজারের সহায়তা এবং চা ও জুট শিল্পের আধুনিকীকরণের

মতো পরিকল্পনা সামনে এসেছে। সিন্ধুরে MSME ও বৃহৎ শিল্পের সমন্বিত শিল্প পার্কের প্রস্তাবও প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু শিল্প মানে শুধু কারখানা নয়। শিল্প মানে রাস্তা, বিদ্যুৎ, বন্দর, রেল, দক্ষ শ্রমিক, দ্রুত প্রশাসনিক অনুমোদন এবং বিনিয়োগের আস্থা। সেই কারণেই কালনা-শান্তিপুর সংযোগ, কলকাতা ও নিউটাউনের যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডানকুনি-মগরা করিডোর এবং বিভিন্ন সড়ক উন্নয়নের মতো পরিকাঠামোগত উদ্যোগের সঙ্গে শিল্পনীতিকে একসঙ্গে দেখতে হবে। রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ সেতু নির্মাণ এবং কৌশলগত পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ত বিভাগ ৭,২৪০. ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো কে মজবুত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ আরও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্য নিয়ে একাধিক বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

নতুন অধ্যায়ের আসল পরীক্ষা

একজন সাধারণ নাগরিকের প্রত্যাশা খুব সহজ—কাজ যেন সময়মতো হয়, সরকারি পরিষেবা যেন সহজে পাওয়া যায়, কৃষক



যেন ফসলের মূল্য পান, ছাত্র যেন ভালো শিক্ষা পায়, নারী যেন নিরাপদ ও স্বনির্ভর হন, রোগী যেন কাছে চিকিৎসা পান এবং যুবক যেন নিজের রাজ্যেই কাজের সুযোগ খুঁজে পান। তাই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের এই নতুন অধ্যায়কে বিচার করার সবচেয়ে কার্যকর মাপকাঠি হবে ঘোষণা নয়, বাস্তবায়ন; পরিসংখ্যান নয়, মানুষের জীবনে পরিবর্তন; প্রতিশ্রুতি নয়, তার সময়সীমাবদ্ধ ফলাফল। সরকারের সামনে এখন বড় দায়িত্ব—সঙ্কল্পপত্রের প্রতিটি প্রতিশ্রুতিকে সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা, নির্দিষ্ট সময়সীমা, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং নিয়মিত জনসমীক্ষার মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেওয়া। আর নাগরিক সমাজের দায়িত্ব—প্রশ্ন করা, তথ্য জানা এবং কাজের হিসাব চাওয়া।

কারণ উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ তখনই পূর্ণ হয়, যখন তার সুফল পৌঁছে যায় শহর থেকে গ্রাম, পাহাড় থেকে সুন্দরবন, কৃষকের মাঠ থেকে ছাত্রের শ্রেণিকক্ষ, মায়ের ঘর থেকে তরুণের কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের নতুন অধ্যায় তাই শুধু সরকারের নয়—এটি প্রশাসন, শিল্প, কৃষক, শ্রমিক, নারী, ছাত্র-যুব এবং প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত দায়িত্ব ও প্রত্যাশার অধ্যায়।





পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রজাতন্ত্রী হিসেবে শ্রী সুনীল বানসাল মহাশয় এবং সহ-পর্যবেক্ষক হিসেবে শ্রী লাল সিং আর্য় মহাশয়, শ্রী রাজেন্দ্র সিং মহাশয় ও শ্রীমতি পিঙ্কি কুশওয়াহা মহাশয়-কে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।



রাজ্যের বিশেষ সাংগঠনিক পর্যবেক্ষক হিসাবে নির্বাচিত শ্রী সৌদান সিং মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।



রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) পদে পুনর্নিযুক্ত হওয়ায় শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।



আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রী কুমার মঙ্গলম বিড়লা-র সঙ্গে আন্তরিক ও ফলপ্রসূ আলোচনায় শ্রী শমীক ভট্টাচার্য। আলোচনার মূল বিষয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা, নতুন বিনিয়োগ এবং বিদ্যমান শিল্পের সম্প্রসারণ।



মুম্বইয়ে বিশিষ্ট শিল্পপতি ও রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান শ্রী মুকেশ আম্বানির বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের। একান্ত আলোচনায় উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা।



পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান শ্রী গৌতম আদানি সহ অন্যান্য প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ। সাক্ষাতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়।





কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।



কলকাতার নিউটাউনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার জি-র নামাঙ্কিত 'কেশব স্মৃতি' ভবনের উদ্বোধন ও লোকাপর্ণ অনুষ্ঠানের পবিত্র বাস্তুপূজন ও হোমযজ্ঞে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।



দিল্লিতে পিএম-সেতু এবং NAPS-NATS বিষয়ক পর্যালোচনা বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।



ছবিতে খবর



প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিনে এসপ্ল্যান্ড মেট্রো স্টেশনে 'আশীর্বাদের প্রদীপ' প্রজ্জ্বলনে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।



প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিনে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর চরণে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের আন্তরিক প্রার্থনা ও পূজা নিবেদন।



প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিনে পলাশীপাড়ায় "আশীর্বাদের প্রদীপ" কর্মসূচিতে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।



বিজেপি সল্টলেক কার্যালয়ে শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির শুভ জন্মদিনে "আশীর্বাদের প্রদীপ" প্রজ্জ্বলন কর্মসূচিতে রাজ্য নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাটে 'আশীর্বাদের প্রদীপ' কর্মসূচির উদ্বোধনে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।





পুরুলিয়ার টািমনার করম আখড়ায় কুড়মি সমাজের বিশাল করম মহা-সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।



নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যকে আরও সুদৃঢ় করতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের ফুটবল ময়দানে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার।



দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার।



বাসন্তী দেবী কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে পদভার গ্রহণ করলেন রাজা বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী।



বিজেপি সল্টলেক কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির শুভ জন্মদিনে "আশীর্বাদের প্রদীপ" প্রজ্জ্বলন কর্মসূচিতে বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী।





কোচবিহারে মদনমোহন মন্দিরে পূজা দিয়ে মদনমোহন দেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।



দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সাব-ডিভিশনের মানুষ সহ জেলার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে গঙ্গারামপুর শহরে "সাংসদ কার্যালয়"-এর শুভ উদ্বোধনের মুহূর্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার।



বিধাননগরের বইমেলা প্রাঙ্গণে 'অন্নপূর্ণা দিবস' উদযাপনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।



কলকাতার নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর মেগা হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৫১ একর জমিতে এই উদ্যোগ বাংলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে।





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন উপলক্ষে জেলায় জেলায় 'আশীর্বাদে প্রদীপ' প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী।





শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পশ্চিমবঙ্গে ভণ্ডামির জায়গা নেই

অনিকেত মহাপাত্র

শ্যামাপ্রসাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও নেহরু তাঁর প্রিয় নবাবজাদার কাছে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা হিন্দুদের স্বার্থকে বিসর্জন দেন। তাই শ্যামাপ্রসাদ আর অপেক্ষা করেননি সেই কুখ্যাত প্যাক্ট স্বাক্ষর হওয়া অবধি ৬ এপ্রিল তিনি পদত্যাগ করেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন এটি ছিল তাঁর স্টান্টবাজি! তাহলে আদ্যন্ত কংগ্রেসি ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী কেন পদত্যাগ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে।



'শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি চলেছে।' পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ বাঙালি হিন্দুর হোমল্যান্ডে এইরকম কথা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতের কেউ কেউ বলছেন আড়ালে আবড়ালে, বেশ সাহস করে! এই কথা আরও বহু বহু জনের রয়েছে বুক গোপনে, সংগোপনো তাঁরা বলছেন না, বলতে পারছেন না কারণ 'ভবিষ্যৎ' বলে কিছু একটা আছে তো! তাই সহ্য করো, সহ্য করো!!!

নিকট অতীতে সুসম্পন্ন হয়েছে 'শ্যামাপ্রসাদ-পক্ষ' সহ পশ্চিমবঙ্গ দিবস। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, মহা বিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়েছে 'ভারত কেশরী' ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে আলোচনা। বিবিধ দিক উন্মোচিত হয়েছে। শিক্ষার্থী জানছেন, জানছেন শিক্ষকরাও। এই ব্যাপারে একটি 'এনেকডট' শেয়ার করা যেতে পারে। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের জৈনৈকাধ্যাপক আমাকে জানান 'এত বছর ধরে অধ্যাপনা করছি। অথচ এর আগে কোনওদিন কেউ তাঁকে নিয়ে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে ন্যূনতম আলোচনা অন্বি করে নি। আমার খুবই ভালো লাগছে তাঁর জীবনকে জানতে। কী কী বই পড়া যায়? তাঁকে যদি জানতে চাই আরও ভালো করো।' অথচ ওই অধ্যাপকের কোনও বিশেষ 'আম্বিশন' নেই যা তাঁকে শ্যামাপ্রসাদ-ভজনায বাধ্য করতে পারে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে এই নব্য চর্চার এটাই সুফল। মানুষ জানলেন, মানুষ শুনলেন, বুঝলেন মানুষ। প্রশ্ন করলেন, করলেন তর্কও। তাহলে প্রাপ্তি? প্রাপ্তি হল, প্রাসঙ্গিক রইলেন শ্যামাপ্রসাদ। বন্দনা করুন বা গঞ্জনা দিন; অবহেলা করতে পারলেন কই! যা করেছিলেন, করতে সমর্থ হয়েছিলেন দীর্ঘ বহু বহু একমাত্রিক দশকা মুখে বলবেন গণতন্ত্রের কথা অথচ অভ্যাস করবেন ও রপ্ত করবেন একনায়কের ভাষা। তা কী করে হয় 'মিত্র'? এবার সংবিধানের কথা বলবেন, আড়াল নেবেন সংবিধানের, যাত্রা করবেন সংবিধান সূচকা ভারত মাতার জয় না বলে,

বলবেন জয় সংবিধানের জয়। বলুন ভালো কথা। আমিও বলছি 'জয় সংবিধানের জয়'। কিন্তু সংবিধানবিরোধী কাজ কেন করেন মিত্র? সংবিধানের সংশোধনের নামে তার অসন্মান কতবার করেছেন? তার মূল সত্যকে কতবার ভুলুগুটিত করেছেন বিদেশকে খুশি করতে ও ভোট লাভের আশায়! আপনারা আজকাল জাতীয় পতাকা

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি? আজ ক্ষমতার পরিবর্তনের পর কি হঠাৎ করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন তিনি? অবশ্যই ২০১৪এ কেন্দ্রে এবং ২০২৬এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ক্ষমতার অলিন্দে পরিবর্তনের পরে! নাকি প্রাসঙ্গিক ছিলেন কিন্তু ঠাণ্ডা ঘরে পাঠানো হয়েছিল! আসলে তাঁকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলেছিল অনেক আগে থেকে। ১৯৫০এর ৮ এপ্রিল স্বাক্ষরিত হওয়া কুখ্যাত নেহরু লিয়াকত প্যাক্ট (দিল্লি প্যাক্ট অন মাইনোরিটি)-এর প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পদত্যাগ করেন মন্ত্রী পদ থেকে।

ও দেশের সংবিধানের আড়াল নিচ্ছেন, অন্তত নিতে বাধ্য হচ্ছেন – এইটুকু আমাদের প্রয়াসের ফল অর্থাৎ সাফল্য। এটা সেই ডার্ক সাইকোলজি যখন দুটো অপশনই আমাদের।

আপনাদের সংবিধানের প্রতি এই ভক্তি আর বেড়ালের একাদশী একই বিষয়।

মানুষকে বোকা বানানোর উপায়। কারোর কাছে পকেট ডিকশনারির মতো সংবিধান। ওপরের মলাটে লেখা রয়েছে সংবিধান। কোন দেশের তা কেউ খুলে দেখার সুযোগ পায়নি। নাকি ভেতরটা ফাঁকা তাও নিশ্চিত নয়।

আসলে তাঁরা ভুলিয়ে দিতে চান এক যুগান্তকারী সংবিধান যাত্রাকো 'এক দেশে দুই বিধান, দুই প্রধান, দুই নিশান চলবে না।' এই প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর পাথেয়া। এই যাত্রার জন্য তিনি প্রাণ বাজি রেখেছিলেন, ছেড়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বও। ২৩ জুন, ১৯৫৩ সাধারণভাবে তাঁকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে সেইসব শক্তি যাদের হাতে কুক্ষিত হয়েছে সংবিধান। তিনি থাকলে অসুবিধে হত দেশকে ও দেশের সংবিধানকে। ইচ্ছে মতো দুমড়ে মুচড়ে দেওয়া। আজ ২০২৬ সাধারণভাষের সেপ্টেম্বর মাসে দাঁড়িয়ে যদি ফিরে দেখা যায় অতীতের দিকে, তবে বোঝা যাবে প্রকৃত সত্যকে কিংবা কোনও শুভ চিন্তাকে কখনও পুরোপুরি ভুলিয়ে দেওয়া যায় না। কিছুদিনের জন্য তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা যায় মাত্র।

দুরন্ত বাম দুর্গের বিধি বাম! যাদবপুরের তথাকথিত বাম আধিপত্য অস্তাচলো যদিও কারও কারও মনে এখনও রয়েছে সংশয়! জাতীয়তাবাদীদেরও কারও কারও মনে, 'সম্ভব তো!' 'দিমাগ' যাদের অপরিপক্ক সেইরকম বামমনস্ক কারও কারও মনে এখনও দৃঢ় প্রত্যয় 'আছি, ওরে আছি! থাকবও!' আত্মবিশ্বাস ও মূর্ততার (মূর্খের) স্বর্গ-অভিযানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দ্বারা সৃষ্ট এই 'হিন্দু হোমল্যান্ড'-এ এই স্ববিরোধী, আত্মঘাতী পরম্পরার পায়ের তলার মাটি সরেছে। যদুবাবুর বাজারের গলিঘাঁজির কয়েকটি নিষিদ্ধ গাঁজা চরসের দোকান আর তাদের আত্মগোপনের জন্য যথেষ্ট নয়। দখলদারের উচ্ছেদ চলেছে। এখন ময়দানা সবই প্রকাশ্য। এবার সামনে এসো মর্কটের দলা। তোমাদের পৃষ্ঠপোষকরাও লুকোনোর জায়গা খুঁজছে। কিংবা বাজারে বেরিয়েছে



নামাবলী কিনতো ব্যর্থ হয়ে ফিরছে তারা। বিক্রি নেই, বিক্রি নেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই পশ্চিমবঙ্গে ভগুদের কোনও জায়গা অমিলা।

কেন প্রাসঙ্গিক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি? আজ ক্ষমতার পরিবর্তনের পর কি হঠাৎ করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন তিনি? অবশ্যই ২০১৪এ কেন্দ্রে এবং ২০২৬এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ক্ষমতার অলিন্দে পরিবর্তনের পরে! নাকি প্রাসঙ্গিক ছিলেন কিন্তু ঠাণ্ডা ঘরে পাঠানো হয়েছিল! আসলে তাঁকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলেছিল অনেক আগে থেকে। ১৯৫০এর ৮ এপ্রিল স্বাক্ষরিত হওয়া কুখ্যাত নেহরু লিয়াকত প্যাক্ট (দিল্লি প্যাক্ট অন মাইনোরিটি)-এর প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পদত্যাগ করেন মন্ত্রী পদ থেকে। এই প্যাক্ট ২ এপ্রিল থেকে ড্রাফট হতে শুরু করে লিয়াকতের দিল্লিতে উপস্থিতি সহ। শ্যামাপ্রসাদদের বিরোধিতা সত্ত্বেও নেহরু তাঁর প্রিয় নবাবজাদার কাছে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা হিন্দুদের স্বার্থকে বিসর্জন দেন। তাই শ্যামাপ্রসাদ আর অপেক্ষা করেন নি এই কুখ্যাত প্যাক্ট স্বাক্ষর হওয়া অবধি ৬ এপ্রিল তিনি পদত্যাগ করেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন এটি ছিল তাঁর স্ট্যান্ডবাজি! তাহলে আদ্যন্ত কংগ্রেসি ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী কেন পদত্যাগ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানানো যেতে পারে যে, নেহরু পরিচালিত প্রথম মন্ত্রিসভায় এই দুইজন বাঙালি মন্ত্রী গৃহীত হন। তাঁরা যে যোগ্য ছিলেন সেই ব্যাপারে সন্দেহ করতে হলে আপনাকে বিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর চয়ন – প্রতিভার প্রতি সন্দেহ করতে হয়। তাহলে সেই দুই যোগ্যদের কেন অবহেলা করা হল? কয়জন ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগীর নাম জানেন! ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে! কারণ লিয়াকত শুধু চুক্তির নামে হিন্দুদের সর্বনাশ করেই থেমে থাকেন নি। এই সর্বনাশ যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তার জন্য পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে গেলেন। তাই যারা পাকিস্তান তৈরির জন্য সর্বস্ব দিল, ভোট দিল, আরও

অনেকগুলি পাকিস্তান তৈরির লক্ষ্য নিয়ে তাদের ভারতে রেখে গেলেন। আপিলা চাপিলার স্রষ্টারা চেয়েছিলেন অনুগত পাকিস্তানি হতো কিন্তু থাকতে আর দিল কই! যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল চেয়েছিলেন পাক – ওয়াতনের স্নিগ্ধ ছায়া। কিন্তু সেই ছায়া আর 'যোগেন মণ্ডল' থেকে পাওয়া যাবে কী সাইফুল ইসলাম হতে হবে! শরৎচন্দ্র বসুরা চেয়েছিলেন যুক্ত বাংলা। না ছিল তাঁদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, না ছিল বিচ্ছিন্নতাকামীদের 'তাকিয়া' বোঝার ক্ষমতা। পাকিস্তান দায়িত্বের সঙ্গে হিন্দু ও শিখদের প্রায় সমাপ্ত করে দিয়েছে। এই গতিতে যদি তারা চলতে পারে খুব তাড়াতাড়ি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে



পারবে তাদের। জিন্নার প্রেতাত্মা খুশি হবেন কি! আর পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমানের বাংলাদেশ কিন্তু পাকিস্তানকেও পিছনে ফেলে দিতে পারে হিন্দু নির্যাতনে ও ধর্মীয় কট্টরতায়। আসলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সেই 'মানবিক' দৃষ্টিকোণ ও ৭১ সালের 'বৃহত্তর স্বার্থে' সেই নিরলস ও নিরন্তর পাকিস্তানি ডি.এন.এ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার ফলে বর্তমানে পাকিস্তানি আর বাংলাদেশি আলাদা করা যায় না। গোঁড়ামি ও জঙ্গিনায় সারা বিশ্বের মধ্যে এরা অগ্রগণ্য। এরা শুধু যেখানে সংখ্যা গুরু সেখানেই অন্যেরা নিশ্চিহ্ন হওয়ার অপেক্ষায় এমনটা নয়। যেখানে তাঁরা তুলনায় সংখ্যায় কম সেখানেও অন্য মানুষেরা সম্ভ্রান্ত হয়ে থাকেন

এঁদের কার্যকলাপে সমস্ত ইউরোপ এদের বিশৃঙ্খলায়, উগ্রবাদী মানসিকতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সম্ভ্রান্ত। এদের জন্য ইউরোপের সাধারণ মানুষ সমস্ত এশিয়ানকেই ভয় পেতে ও ঘৃণা করতে শুরু করেছে। পাকিস্তানি মুসলিমরা ব্রিটেনে শিশু ও কিশোরী মূলবাসী মেয়েদের টাগেটি করে অত্যাচার করতে শুরু করেছে। ফ্রান্স, সুইডেন, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস সর্বত্র এদের সম্ভ্রাস ও আধিপত্যের কালো ছায়া আরও ঘন হয়ে আসছে। ইউরোপের সভ্যতা আবার এক ক্রুসেডের সামনে দাঁড়িয়ে। থাইল্যান্ডের নাম আমরা সাম্প্রতিক সময়ে এক সুপ্রাচীন শৈবক্ষেত্র ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে কম্বোডিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার খবরে শুনেছি। কিন্তু আবার থাইল্যান্ড খবরের শিরোনামে, ইসলামীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ। থাইল্যান্ডের মুসলিম অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলের আলাদা স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র না গড়া পর্যন্ত লড়াই চলিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে 'স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী' 'বারিসান রেভোলুসি ন্যাশনাল (বিআরএন)। দুদিন আগে বার্তাসংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন দলটির প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র নিকামাতুল্লাহ সেরি। বাংলাদেশি সংবাদপত্র এই গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করছে 'স্বাধীনতাকামী হিসেবো' বাংলাদেশ আসলে গ্লোবাল জঙ্গিনার একটি গুরুত্বপূর্ণ 'হাব'। সাহিত্য ও সংস্কৃতিসাধক, চিন্তক বাঙালি (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের হিন্দু হল বাঙালি। আর বাংলাদেশের মুসলমান হল বাংলাদেশি। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান মূলত দুটিভাবে পরিচিত বাংলাভাষী মুসলমান ও উর্দুভাষী মুসলমান) কীভাবে টিকে থাকতে পারত এই জঙ্গিনার সঙ্গে লড়াই করে!

একটি কোনও ঘটনা বা কোনও ব্যক্তির মূল্যায়ন কখনওই সমকালে সম্ভব নয়। কালের দূরত্ব দরকার। ঘটনাকাল বা জীবৎকালের পরে বিভিন্ন ঘটনাপর্বে সেই ঘটনা বা ব্যক্তির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া-কল্পনা একটি রূপের জন্ম দেয়। অর্থাৎ ড.



শ্যামাপ্রসাদ যা ভেবেছিলেন (অনুমিত), লিখেছিলেন, বলেছিলেন এবং করেছিলেন তাকে ঠিক বলে খুবই দায়িত্বের সঙ্গে প্রমাণ করে দিয়েছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এবং সেখানকার মানুষ নিজেদের হিন্দু-বিদ্বেষ (বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানও রয়েছে) ও জঙ্গি মানসিকতা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন ১৯৪৭ সাধারণভাবে ঠিক ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। শরৎচন্দ্র বসুরা ছিলেন অপরিপক্ব ও ভাববাদী। এমনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দ্বারা সৃষ্ট এই 'হিন্দু হোমল্যান্ড'-এ হিন্দুর অর্থাৎ বাঙালির সঙ্গীন অবস্থা গ্রামের পর গ্রাম মুর্শিদাবাদে, দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, উত্তর ২৪ পরগনায়, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, নদীয়া, মালদায় হিন্দুরা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। শহর কলকাতায় বন্দর, মেটিয়াবুরুজ, পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার যেন মধ্যযুগের নিদর্শন। যদি যুক্তবঙ্গ হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ একসঙ্গে থাকত এবং এটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হত তাহলে বাঙালি নামটি পৃথিবী থেকে মুছে যেত। সিন্ধি বা পারসিদের দশা হতই। বাঙালি যার নিজের কোনও ঘর নেই!

কোনও একজন ব্যক্তি, যাকে যুগন্ধর মনে করেন, তাঁর প্রতি সর্বাধিক উপযুক্ত উপায় কী? কথামুতের সেই গল্পের কথা মনে পড়তে পারো প্রভু আসবেন তাঁর বাগানো সেই বাগানে রয়েছেন দুই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। প্রথমজন প্রভু পদার্পণ করতেই, লেগে গেলেন গুণ বর্ণনায়। আহা! কী রূপ! অনিন্দ্যসুন্দর নেত্র যুগল ইত্যাদি ইত্যাদি! সঙ্গে লেগে রইলেন সারাক্ষণ। আর দ্বিতীয়জন এইরকম কোনও বন্দনা বা ভজনার পরিকল্পনা না করে। কাজ করে গেছেন। সাজিয়েছেন বাগান। করেছেন পরিচর্চা। নিখুঁত করবার চেষ্টা করেছেন সব কিছু। অসার প্রথম পস্থা কিছুই নতুন বয়ে আনবে না। দ্বিতীয় পস্থায় রয়েছে আদর্শের মুক্তি, দেশের জাগরণ। ধর্মের বহমানতা। সেখান থেকেই প্রশ্ন ওঠে আমরা শুধু ড. শ্যামাপ্রসাদের জীবন ও কৃতি জেনে আর

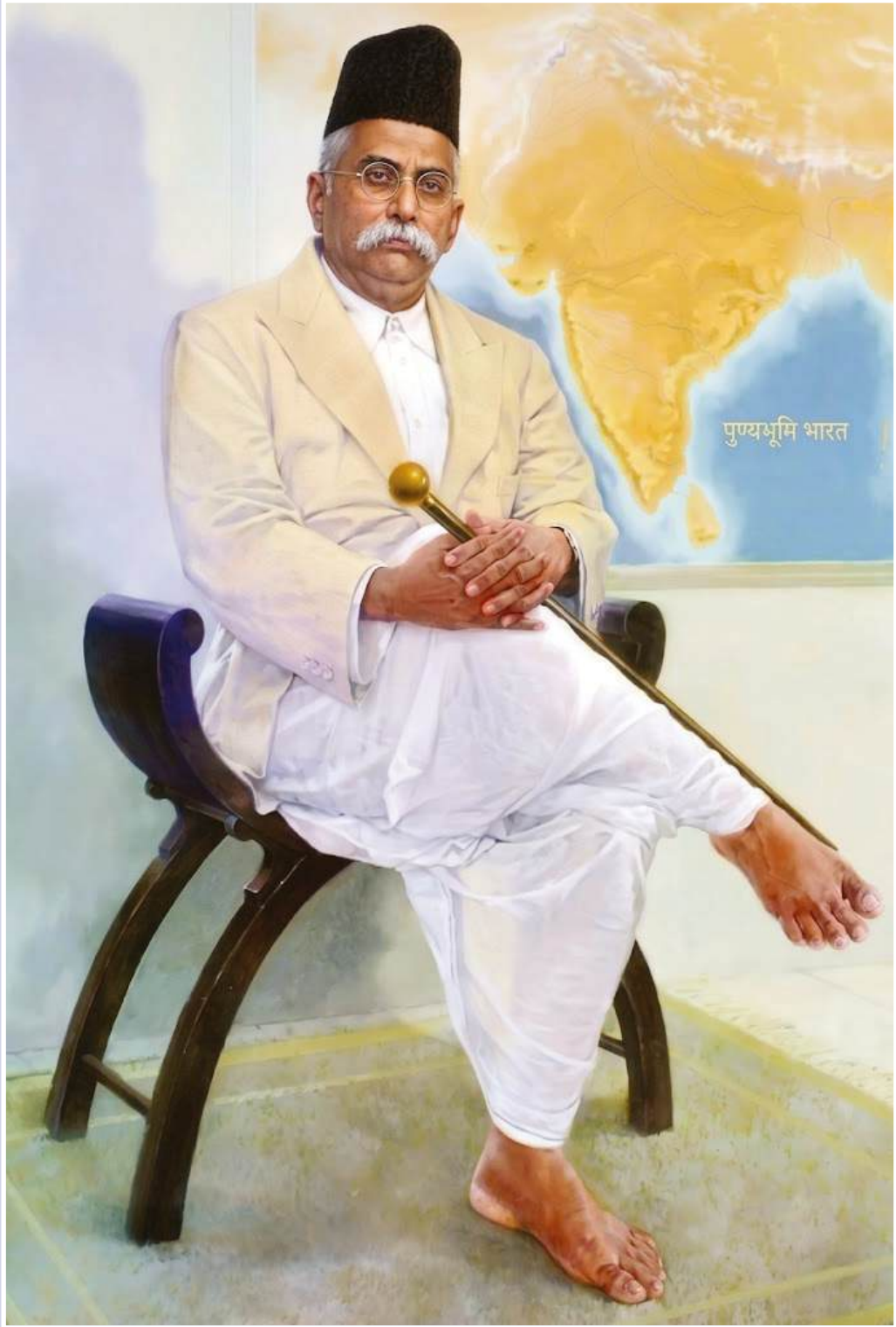


চর্চা করেই বসে থাকব! তাঁর জীবনের বা তাঁর অভিপ্রায়ের এই সময়ে দাঁড়িয়ে ইন্টারপ্রিটেশন কী! তার ওপরই নির্ভর করবে আমরা তাঁকে কতটা নিতে পারলাম!

বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের অধিকার একেবারে ছেড়ে দেওয়া নয়। বাঙালিরা সেখানকার ভূমিখণ্ড দাবি করুন। 'ব্যাক টু দ্য রুট' এবং 'ব্যাক টু দ্য ল্যান্ড' নিয়ে সোচ্চার হন। আমাদের সনাতন পস্থা ছেড়ে যাঁরা অন্য পস্থায় গেছেন তাঁদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এই ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। সনাতন পস্থায় তাঁদের উপযুক্ত সম্মান থাকবে ও ট্রানজিট রিলিজিয়নের গুণ্ডাদের থেকে তাঁদের নিরাপত্তা থাকবে সুনিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কোনও অস্তিত্বের সংকটে থাকবেন না। পূর্ববঙ্গ পুনরায়

হিন্দুবৃত্তের অন্তর্গত হবে। তবেই সার্থক হবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন। সেই স্বপ্নেরই উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি, সেই উত্তরাধিকারের দায় আমাদের বহন করতে হবে বইকী! তাই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে চর্চা অতিরিক্ত কিছু নয় বরং আবশ্যিক। তাঁর চিন্তন ও অভিপ্রায়কে চর্চায় পরিণত করবার প্রয়োজন রয়েছে। আর রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিত শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ পালন আর কিছুই নয়, এটি হল সেই এন্টিবায়টিকের কোর্স যা গভীরতর অসুখের নিরাময়ে প্রয়োগ অনিবার্য ছিল। রোগ এখনও উপস্থিত তাই নিয়মিত ব্যবধানে এর প্রয়োজন পড়বে। তাই শ্যামাপ্রসাদ আমাদের চিন্তা-চেতনার ধারায় এক আবশ্যিক বাস্তবতা।





अनुशीलन समितिर विप्लवी ছিলেন डाक्टर हेडगेওয়ার

अध्यापक ड. अयन बन्द्योपाध्याय



১৮৯৯-এর ১লা এপ্রিল বা বর্ষ প্রতিপদ বা হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের প্রথম দিন (বিক্রম সম্বত) বলিরাম পন্ত হেডগেওয়ার ও রেবতী বাঈ-এর কনিষ্ঠ পুত্র কেশব জন্মগ্রহণ করেন। বলিরাম ছিলেন বৈদিক শাস্ত্রে পণ্ডিত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কেশবের প্রপিতামহ নরহর শাস্ত্রী হায়দ্রাবাদ থেকে নাগপুরে চলে আসেন নিজামের ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য। বেদে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁরা নাগপুরের ভৌসলে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পান। কিন্তু ১৮৫৩-এ নাগপুর ইংরেজরা দখল করে নিলে এই পৃষ্ঠপোষকতায় ছেদ পড়ে। কেশবকে প্রথমে সংস্কৃত স্কুলে তারপর সেন্ট্রাল প্রভিন্সের সেই সময়ের সবচেয়ে পুরানো ও নামী নীল সিটি স্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৯০২ সালে নাগপুরে ভয়াবহ প্লেগের প্রকোপ দেখা দেয়। এতে কেশবের বাবা-মা দু'জনই মারা যান। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁকে একই দিনে তাঁর পিতা-মাতার শ্মশান যাত্রা প্রত্যক্ষ করতে হয়।

১৮৯৭ সালে কেশবের যখন মাত্র ৮ বছর বয়স তখন রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের হীরক জয়ন্তী পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ভারতবর্ষ জুড়ে। এই উপলক্ষ্যে কেশবের স্কুলেও মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছিল। বালক মিষ্টি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অশ্রুসজল চোখে বলে "ও আমাদের রাণী নয়।" আট বছরের বালকের মধ্যে দেশের স্বার্থবিদ্রোহী মনোভাবের এই প্রথম বালক।

সে যুগের বহু বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মত কেশবও তাঁর স্বাদেশিকতার যাত্রা শুরু করেন একটি 'আখড়া' (ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী কুস্তি অনুশীলনের জায়গা) থেকে। নাগপুরের শিবরাম গুরুর আখড়া জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। এখানেই ১৯০৪ সালে কেশবের সঙ্গে ডাঃ বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জের পরিচয় হয়। মুঞ্জের ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনাসম্পন্ন একজন মানুষ। তিনি ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলকের অনুগামী। উভয়ের সম্পর্ক অতি দ্রুত ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ১৯০২ সালে তিলক নাগপুরে যান এবং কেশবের তখন তাঁর বক্তৃতা শোনার ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়। খুব কম বয়স থেকে 'কেশরী' পত্রিকা পড়ার ফলে কেশবের মনে তিলক সম্পর্কে এক প্রচণ্ড শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন শিক্ষিত ভারতীয়দের আকর্ষিত করে। ফলে বহু বিপ্লবী সমিতি গড়ে ওঠে। এই ধরনের কাজকর্মে সর্বাধিক এগিয়ে ছিল বাংলা। এই



নাগপুরে হেডগেওয়ার স্মৃতি মন্দিরে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্চ্য।

প্রদেশের বিপ্লবীদের কাজকর্ম অন্যান্য প্রদেশের মানুষদেরও উদ্বুদ্ধ করে। মিডল এক্সাম পাশ করে কিশোর কেশব সেন্ট্রাল প্রভিন্সের বিভিন্ন বিপ্লবীদের সঙ্গে সময় কাটাতে থাকেন। সেসময় মহারাষ্ট্র বলে কোন রাজ্য ছিল না। বর্তমান মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিসগড়ের

একটি বড় অংশ নিয়ে গঠিত ছিল ব্রিটিশ আমলের সেন্ট্রাল প্রভিন্স। এর রাজধানী ছিল নাগপুর। যাই হোক, মাধবদাস সন্ন্যাসী নামে বাংলার এক বিপ্লবী এই সময় নাগপুর আসে। কেশব-কে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে গোপনে রাখার। জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পূর্বে মাধবদাস নাগপুর ও তার আশেপাশে প্রায় ৬ মাস কাটান। আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়া বিপ্লবীদের আইনি লড়াই লড়ার জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয়।

হিন্দুদের জন্য কাশীর যা স্থান, ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের জন্য তাই ছিল কলকাতার স্থান। কেশবও চাইতেন কলকাতায় আসতে এবং এখানের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হতে। অবশ্য তিনি তখন ছিলেন পুলিশি নজরদারির অধীন। তিনি সিনিয়র ম্যাট্রিকুলেশন (মিডল) পরীক্ষায় উচ্চ দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। তাঁর আগ্রহ ছিল বিজ্ঞানের প্রতি। আন্তরিকতা ও কাজের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠার ফলে কেশব দ্রুতই সেন্ট্রাল প্রভিন্সের তিলকপন্থীদের সুনজরে পড়েন। তাঁরা তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে

**১৮৯৭ সালে কেশবের যখন
মাত্র ৮ বছর বয়স তখন
রাণী ভিক্টোরিয়ার
সিংহাসনারোহণের হীরক
জয়ন্তী পালনের উদ্যোগ
নেওয়া হয় ভারতবর্ষ জুড়ে।
এই উপলক্ষ্যে কেশবের
স্কুলেও মিষ্টি বিতরণ করা
হচ্ছিল। বালক মিষ্টি ছুঁড়ে
ফেলে দিয়ে অশ্রুসজল
চোখে বলে "ও আমাদের
রাণী নয়।" আট বছরের
বালকের মধ্যে দেশের স্বার্থে
বিদ্রোহী মনোভাবের
এই প্রথম বালক।**



ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। ডাঃ মুঞ্জি ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কেশবকে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি করার সমস্ত প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন- যাতে কেশব কলকাতায় কোথাও থেকে তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং পড়াশোনা একই সঙ্গে চালানোর সুযোগ পান। রামলাল বাজপেয়ী তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হেডগেওয়ারের কলকাতায় থাকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এখানের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং বাংলা ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের বিপ্লবীদের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার সেতু হিসাবে নিজেকে কাজে লাগানো।

ডাঃ এসকে মল্লিক, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাহায্যে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন'—এ যে সমস্ত ছাত্ররা পড়াশোনা করত তারা এই কলেজে ভর্তি হত, কারণ তাদের কোন সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি নেওয়া হত না। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এই কলেজে পড়তে আসায় এটির একটি সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল। মারাঠি ছাত্ররাও এখানে পড়তে আসত। এদের মধ্যে ওয়াই এস অ্যান্‌, নারায়ণরাও সাভারকর, এথালভে প্রমুখ ছিলেন কেশবের বন্ধু।

কেশব যখন কলকাতায় পৌঁছেন তখন বাংলা বিশেষত কলকাতার বিপ্লবীদের ওপর

**ডাঃ মুঞ্জি ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের
অন্যান্য জাতীয়তাবাদী
নেতৃবৃন্দ কেশবকে কলকাতার
ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে
ভর্তি করার সমস্ত প্রচেষ্টা
চালাতে থাকেন- যাতে কেশব
কলকাতায় কোথাও থেকে
তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং
পড়াশোনা একই সঙ্গে
চালানোর সুযোগ পান।
রামলাল বাজপেয়ী তাঁর
আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে
বলেছেন যে, হেডগেওয়ারের
কলকাতায় থাকার প্রধান
উদ্দেশ্য ছিল এখানের
বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত
তথ্য সংগ্রহ করা এবং বাংলা
ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের
বিপ্লবীদের মধ্যে সম্পর্ক
রক্ষার সেতু হিসাবে নিজেকে
কাজে লাগানো।**

পুলিশ নিপীড়ণ পুরোদমে চলছে। এইসময় সরকার Seditious Assembly Act (১৯০৭), Criminal Law Amendment Act (১৯০৮) এবং Indian Press Act (১৯১০)-এর ব্যবহার করে বিভিন্ন বিপ্লবী সংস্থা, প্রকাশনী এবং বিপ্লবীদের শনাক্তকরণ, নিষিদ্ধ করা এবং শাস্তি দিতে ব্যস্ত ছিল। ঔপনিবেশিক সরকার তখন বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যদের ও সংযোগ রক্ষাকারীদের গ্রেফতার করছিল, এর মধ্যে বান্ধব সমাজ, অনুশীলন সমিতি ও আত্মোন্নতি সমিতি ছিল প্রধান। তদানীন্তন বাংলায় এই ধরনের নিষিদ্ধ বৈপ্লবিক সংগঠন ছিল প্রায় ৫০টি। ১৯০২-এ প্রতিষ্ঠিত হওয়া 'অনুশীলন সমিতি' ছিল এই ধরনের সংগঠনগুলির মধ্যে প্রধান ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার প্রায় সমস্ত প্রথম সারির স্বাধীনতা সংগ্রামী এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, পুলিনবিহারী দাস, ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী, নলিনী কিশোর গুহ, প্রতুল গাঙ্গুলি, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন বিপ্লবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

হেডগেওয়ার কলকাতায় পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই অনুশীলন সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি সমিতির অত্যন্ত বিশ্বস্ত সদস্য পরিণত হন এবং তিনি যেখানে থাকতেন সেটি বৈপ্লবিক কাজকর্মের একটি



নাগপুরে হেডগেওয়ার স্মৃতি মন্দিরে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের প্রতি শ্রী মোহন ভাগবত জীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।





নাগপুরে হেডগেওয়ার স্মৃতি মন্দিরে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের প্রতি শ্রী অমিত শাহের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

কেন্দ্রে পরিণত হয়। আত্মগোপন করে থাকার সময় বিপ্লবী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মাঝেমধ্যে তাঁর বাসস্থানে আসতেন। বিপ্লবী নলিনী কিশোর গুহ ও তাঁর সহকর্মীদের জন্য এটি একটি আত্মগোপন করে থাকার এবং অস্ত্র লুকিয়ে রাখার জায়গায় পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে নলিনী কিশোর গুহ তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' বইয়ে লিখছেন, "হেডগেওয়ার ছিলেন সবদিক থেকেই একজন প্রকৃত বিপ্লবী। তিনি সমিতিতে পরিচিত ছিলেন তাঁর গঠনমূলক চিন্তাভাবনা ও কাজের জন্য।" বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে হেডগেওয়ারের ছদ্মনাম ছিল 'কোকেন'। সমিতির সদস্যদের শপথ নিতে হত যে এর কোন ঘটনা বা কাজকর্ম সম্পর্কে বাইরের কাউকে জানানো যাবে না। চরম গোপনীয়তা রক্ষা করা হত বিভিন্ন কাজকর্মের। অনুশীলন সমিতিতে হেডগেওয়ারকে নির্দিষ্টভাবে কী কী কাজ করতে হতো সে সম্পর্কে তথ্যের অভাব আছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যুক্ত সমিতির অন্যান্য সদস্যরা সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, যিনি প্রায় ২৪ বছর জেলে কাটিয়েছিলেন, তাঁর বই 'In Search of Freedom' গ্রন্থে লিখেছেন, হেডগেওয়ার অনুশীলন সমিতির গোপন অংশে একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে কাজ করতেন।

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী জীবনতারা হালদার তাঁর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা' গ্রন্থে লিখেছেন যে- "কেশব ম্যাট্রিক পাশ করে বিপ্লবের পীঠস্থান বাংলায় যাবার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় এসে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। উদ্দেশ্য বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়ানো। অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েই ভিতরের গোষ্ঠীতে প্রবেশের অধিকার পেলেন তিনি। ব্রৈলোক্য চক্রবর্তী, পুলিন দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন কেশব।

দামোদরের বিধ্বংসী বন্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সমিতির অন্যান্য সভ্যদের নিয়ে ত্রাণকাজে যোগ দিয়ে সমাজ সেবার অভিজ্ঞতাও সংগঠন করলেন তিনি।"

হেডগেওয়ার মতিলাল ঘোষ ও আশুতোষ মুখার্জি-র ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং রাসবিহারী ঘোষ ও বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। বালশাস্ত্রী হরদাস তাঁর 'Armed Struggle for Freedom' গ্রন্থে লিখেছেন, "Hedgewar won the hearts of young revolutionaries through the purity of character, commitment and extraordinary organizational capacity. There was a big retinue of patriots who held a lot of reverence for him."

অনুশীলন সমিতির খ্যাতনামা বিপ্লবী ব্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর এবং পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন যে- "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক-সঙ্ঘের (R.S.S) অধিনায়ক শ্রী কেশব হেডগেওয়ার আমাদের অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি যখন ১৯১০ সনে কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল পড়তেন, তখন তিনি, বীর সাভারকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ দামোদর সাভারকর, ডাঃ এথলে (সাতারা) এবং আরও কিছু মহারাষ্ট্রদেশীয় যুবক, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্র আমাদের বিপ্লব-দলে যোগ দিয়াছিলেন। 'বাংলায় বিপ্লববাদ' পুস্তকের লেখক শ্রী নলিনীকিশোর গুহ ঐ সময় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পড়তেন, তিনি তাঁহাদিগকে দলে টানিয়া আনেন। আমার পলাতক অবস্থায় আমি ২/১ বার তাঁহাদের ছাত্রাবাসে ছিলাম। ১৯৪০ সনে আমি হঠাৎ তাঁহার নাগপুরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হই এবং জিজ্ঞাসা করি "কালীচরণ দা'র কথা মনে আছে কি?" তিনি আমাকে



জড়াইয়া ধরিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ভলান্টিয়ার-বাহিনীর সংখ্যা কত?" তিনি বলিলেন, "৬০ হাজারা"..." আমি তাঁহার সহিত আলাপ শেষ করিয়া কাশী যাই। নাগপুর শহরে হেডগেওয়ারের একখানা ছোট্ট বাড়ী ছিল, আমি সেই বাড়ীতে ছিলাম।"

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক রাকেশ সিনহা তাঁর 'ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার' গ্রন্থে দেখাচ্ছেন যে, ভারত সরকারের 'Criminal Intelligence office' ১৯১৪-র জানুয়ারীতে "Political Criminals of India" বলে একটি পুস্তিকা বার করে। বইটিতে তাদের নামই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। "যারা বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবী সংগঠন ও তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত" এবং যারা "বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ বানাতে সক্ষম"। এই পুস্তিকাটি পুলিশ ও গোয়েন্দা দফতরে 'Book 1914' হিসাবে পরিচিত ছিল। সেন্ট্রাল প্রভিন্স থেকে হেডগেওয়ারের নাম এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁর শারীরিক গঠন (হেডগেওয়ার ৬ ফুটের ওপর লম্বা শালগ্রাংশু চেহারার অধিকারী ছিলেন) এবং নাগপুরের নীল সিটি স্কুল থেকে অনুশীলন সমিতি পর্যন্ত তাঁর নানা কার্যকলাপের বিবরণ এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়।

সমস্ত ধরনের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার পরেও হেডগেওয়ার বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। ১৯১৪-র সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় ৭০.৮% নম্বর পেয়ে তিনি উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করেন। শারীরতত্ত্ববিদ্যা-য় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন ১৯১১-১২ ও ১৯১২-১৩ সালে পরপর দু'বার। কলকাতার ভিক্টর হসপিটালে ট্রেনি হিসাবে ১৯১৫-র মাঝামাঝি দু'মাস কাজ করেন হেডগেওয়ার। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন ১৯১৪-১৫ সালে একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকারের প্রচণ্ড দমন-পীড়ন, বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য, অতীষ্ট লক্ষ্য পূরণ না হওয়া প্রভৃতি ছিল এর

প্রধান কারণ। হেডগেওয়ার নাগপুরে একজন পুরোদস্তুর চিকিৎসক হিসাবে ফিরে যান।

ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৬০ সালে কলকাতার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শীতকালীন অধিবেশনে বলেছিলেন- "সঙ্ঘের সকল কাজ ও প্রোগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতার এক মহান চিন্তা দিয়েই প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি (হেডগেওয়ার) এক বিশাল ভাবনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন- লক্ষ্য ছিল সঠিক অর্থে জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ঘটিয়ে জাতিকে শক্তিময় মহাপরাক্রমশালী করে গড়ে তোলা। তিনি সাহসের সঙ্গে সত্য কথাটি বলেছিলেন, এই মহান দেশে হিন্দুরাই মূল নাগরিক। বহু লোক একথা বলতে লজ্জা পান, যদিও তাঁরা জানেন এই-ই ঠিক কথা। আমাদের সাহসের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যখন এ দেশের মহান সংস্কৃতি, অতীতের কথা বলি তখন হিন্দু ইতিহাস, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতার কথাই বলি, সে জন্যই গর্ববোধ করি। আমি বুঝতে পারি না, এঁরা কেন একথা স্বীকার করতে লজ্জা পায় যে এ দেশের মহান অতীত ও মহান সংস্কৃতি আসলে হিন্দু অতীত ও হিন্দু সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

- অধ্যাপক রাকেশ সিনহা, ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার
- বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, জেলে ত্রিশ বছর এবং পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম
- বালশাস্ত্রী হরদাস Armed Struggle for Freedom
- নলিনী কিশোর গুহ বাংলায় বিপ্লববাদ
- বিপ্লবী জীবনতারা হালদার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা
- বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, In Search of Freedom





আবারও ভণ্ডুল রাহুলঃ ঘেটে ঘন্ট ইন্ডির পিন্ডি

জয়ন্ত গুহ

হেরে যাওয়ার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ইন্ডি জোটের পিন্ডিতে রাগ তো একটা ছিলই। সামনে টার্গেট জ্ঞানেশ কুমার হলেও, আসল টার্গেট নরেন্দ্র মোদী এবং ভারত বিরোধীতার নতুন ছকা সামনেই উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন। এখন তো রাহুল-মমতা-কেজরি-অখিলেশরা একটু গণতন্ত্রের কথা বলে নাকি-কান্না কাঁদবেই। ওদের কাছে ছাপ্পা দিতে পারলে গণতন্ত্র, ছাপ্পা দিতে না পারলে ষড়যন্ত্র।

জ্ঞানেশ কুমারকে কেন্দ্র করে রাহুলের হলে যখন ইন্ডি জোট, তরুণ প্রজন্মকে সামনে রেখে গণতন্ত্রের দাবীতে তোলপাড় করে দিতে চাইছে সারাদেশ তখন নয়াদিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী, জেন-জি প্রজন্মকে নিয়ে ভজন ক্লাবিং-এ পোয়েটিক বার্তা দিলেন, বিরোধীদের বালখিল্যসুলভ রাজনীতি।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা সেই বিখ্যাত গান- কতদূর আর কতদূর, বলো মা। বহুদিন মনে থাকবে সেই গান। তবে যে মায়ের কথা ভেবে আমার এই গানের কথা মনে পড়ল সেই মা কিন্তু যে সে মা নয়। আমার-আপনার মা বা দেশমাতৃকাও নয়। এ 'গোর্কির মা'ও নয়। মিশনারি মা টেরেসাও নয়। এ আমাদের গান্ধির মা। না না, এ সেই 'মোহনদাস গান্ধির গান্ধি নয়। গোলমেলে কেসা আসলে 'ঘ্যান্ডি'। দিল্লিতে ঘ্যানঘ্যানে 'ঘ্যান্ডি-বাবা'র বেচারি 'ইটালিয়ান মা'।

বেচারি কেননা প্রত্যেক মা-পিসিমণি-দিদিমণির ভিতর ভিতর একটা ইচ্ছা থাকে, যদি তাঁদের বাড়ির ছেলেটা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়। এই যদি হয়, যদি হয় করতে করতে পেরিয়ে গেল প্রায় ১২ বছর। 'ঘ্যান্ডি-বাবা'র ৫৬ বছর বয়স হয়ে গেল। চুল-দাঁড়ি পেকে গেল। প্রধানমন্ত্রী হওয়া তো দূরের কথা তার নেতৃত্বে, সিপিএম-এর মতই শূন্য থেকে মহাশূন্যে চলে গেল কংগ্রেস। তরুণ প্রজন্মের সমর্থনও দ্রুত কমতে থাকায় অগত্যা রাহুল ঘ্যানঘ্যানে 'ঘ্যান্ডি' এখন আরশোলাদের গেস্টহাউসে অতিথি রাজনীতিক। ওই আরশোলাদের কাঁধে চেপেই 'ঘ্যান্ডি'র বিরাট বিপ্লব 'ছাত্র কি গুঞ্জ' আন্দোলন লঞ্চ হবার কদিন বাদেই পাল্টা লঞ্চ হয় 'বুট কি গুঞ্জ' ওয়েবসাইট। হাতেনাতে ধরা পড়ে 'ঘ্যান্ডি'র ঢপবাজি। তার কদিন বাদেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় আর কেরালায় ছাত্র সংসদ দখল করে এবিভিপি।



অতঃপর 'ঘ্যাণ্ডি'র পরবর্তী বিপ্লব দেশের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে শুরু হরলিকস-বালকের ঘ্যানঘ্যানানি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ। প্রথমে অবশ্য জেলেই ঢুকিয়ে দিতে চাইছিল। বায়না ধরতেই ইন্ডি জোটের বাকি শেয়ালদেরও হুঙ্কা হুয়া, হুঙ্কা হুয়া। কিন্তু সেসব একেবারেই সম্ভব নয় দেখে 'জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ' এবং হেচকি তুলে বায়না 'প্রধানমন্ত্রী ও অমিত শাহ এই ষড়যন্ত্রের মাথায় ছিলেন, তদন্তের আওতায় আনা হোক।' এ যেন অনেকটা গুড়ো আমূল দুধ হাতে নিয়ে চেটে খেতে খেতে বালকের উল্লাস, আমি তো এম্মি এম্মি খাই!

মঞ্চে দাঁড়িয়ে ডায়ালগবাজিতে হাতি-ঘোড়া ফেলে দেওয়া যায় কিন্তু নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহকে ফেলে দেওয়া কি মুখের কথা রে ভাই 'ঘ্যাণ্ডি-বাবা'! তবে একদিন বালকের মোহভঙ্গ হবে। হবেই তার জন্য অপেক্ষা করে আছে সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের সেই বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত- মা... আমার সাধ না মিটিলো, আশা না পুরিলো, সকলই ফুরিয়ে যায় মা...

জ্ঞানেশ কুমারকে কেন্দ্র করে ইন্ডি জোটের এই মোদীবিরোধী রাজনৈতিক ইস্যুর ভিত্তি কিন্তু দেশের নিত্যকার কোনও সমস্যা থেকে উঠে আসেনি। এসেছে একটি ইংরাজি দৈনিকের হাফ-সিদ্ধ একটি রিপোর্ট থেকে।

প্রথম দেখায় লেখাটি ভাল। খুব ভাল। জমাট বুননা। আর্টসাঁট, গতিশীল এবং আকর্ষণীয়। যিনি লিখেছেন তিনি দীর্ঘদিন ধরে এডুকেশন বিট করছেন।

'খুব ভাল' নয় শুধু, দারুন সাংবাদিক এডুকেশন বিটো আর এখানেই একটি বড় প্রশ্ন মাথায় আসবেই। তিনি তার রিপোর্টে ৩ নির্বাচন কমিশনারের অন্যতম সান্দ্রু সাহেবের বিস্তারিত পরিচয় দিলেন কিন্তু তিনি (সান্দ্রু সাহেব) যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ছিলেন সেটা বললেন না কেন? তিনি তো যে সে সাংবাদিক ননা দায়িত্বশীল এবং তুখোড় সাংবাদিক। তাহলে কেন দিলেন না শিক্ষামন্ত্রক সংক্রান্ত সান্দ্রু সাহেবের তথ্য?

খবর দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা সোর্স-এর লিক হওয়া খবর নয়। ডেকে ব্রিফ করা হয়েছে সাংবাদিককে। অন্যায় নয় সেটা কিন্তু 'শিক্ষামন্ত্রক সংক্রান্ত' তথ্য এলনা কেন? খুবই রহস্যময়!

কিছু রিপোর্ট-এ যত না খবর প্রকাশ করা হয়, তার থেকেও বেশী লুকিয়ে ফেলা হয়। আশা করি এই রিপোর্ট তেমনটা নয়। হওয়া উচিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন তো আবারও আসছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে

নাকি কিছু সিদ্ধান্তে সহমত ছিলনা বাকী দুই কমিশনারেরা। হতেই পারে। কিন্তু এটুকুই শুধু রিপোর্টে আছে। তারপর? সিদ্ধান্ত হল কি করে? ৩ কমিশনারের মধ্যে অন্তত ২ জন সহমত না হলে তো পাশ হবেনা কোনও সিদ্ধান্ত। কনসেনসাস বা ভোটটিং। এটাই তো একমাত্র প্রক্রিয়া কমিশনের। এলনা কেন রিপোর্টে? প্রশ্ন উঠল না কেন?

১০ মাসে ১৪ বার যদি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য দুই কমিশনার সহমত না হন তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ৩ জনই সই করলেন কেন? করলেনই যদি তাহলে সই-এর সঙ্গে লেখেননি কেন সহমত না হওয়ার কথা? এ নিয়ে প্রশ্ন উঠল না কেন রিপোর্টে?

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সহমত না হওয়ায় কমিশনাররা নাকি চিঠি দিয়েছেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি-কে? কেন!! কেন চিঠি? কেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি? ওনারা তো সরকারি আমলা ননা ওনারা তো সাংবিধানিক পদে আছেন! ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে কেন জানাবেন? তিনি তো সরাসরি জানাবেন রাষ্ট্রপতিকে! কমিশনে ৩ কমিশনারের সমান ক্ষমতা এবং প্রত্যেকের হাতেই একটি করে ভোট আছে। আলাদা কোনও কাস্টিং ভোট নেই। এখানে তো প্রশ্ন উঠবেই ওঠা উচিত রিপোর্টে। যিনি কমিশনের ভিতরের কথা কমিশনে আলোচনা না করে সংবাদমাধ্যমকে ডেকে জানাচ্ছেন তার দায়িত্ব নিয়েও তো প্রশ্ন

উঠবে। এত দিন ধরে যদি এত গণ্ডগোল হয়েই থাকে উনি চুপ ছিলেন কেন? কেন জানাননি রাষ্ট্রপতিকে? আর সাংবাদিকই বা প্রশ্ন তুললেন না কেন। তিনি তো রিপোর্টার। উনি তো কারও পোর্টার বা সাপোর্টার ননা হওয়া কি উচিত?

প্রশ্ন তোলা হয়েছে ফর্ম-৬ নিয়ে? সেও তো বহু আগেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সুপ্রিম কোর্টে!! বিহার এসআইআর-এর সময়। সুপ্রিম কোর্ট তো এ বিষয় ছেড়ে দিয়েছে কমিশনের ওপরা। বলেছে, কমিশন যা করেছে সেটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া মেনে। আমাদের এ বিষয়ে কিছু করার নেই তাহলে!!

এমন একটা হাফ-সিদ্ধ খবর অনেক মশলা ঢেলে হয়তো গিলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু হজম করানো খুব মুশকিল। আর কেউ যদি ভুল করে ইন্ডি জোটের মত গিলেও ফেলে, বদহজম অনিবার্য। আমাশয়-এর সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।





মোদীজির জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর পৈতৃক গ্রাম ভাদনগরের শর্মিষ্ঠা সরোবরে এক মহা আরতির শুভক্ষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।



প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন উপলক্ষে বারাণসী থেকে ভাদনগর পর্যন্ত বাইক র্যালির সূচনায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং, অন্ধপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী চিরাগ পাসওয়ান।



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে উজ্জয়িনীর রামঘাটে 'প্রদীপ প্রজ্বলন' কর্মসূচীতে বিজেপি জাতীয় সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন।

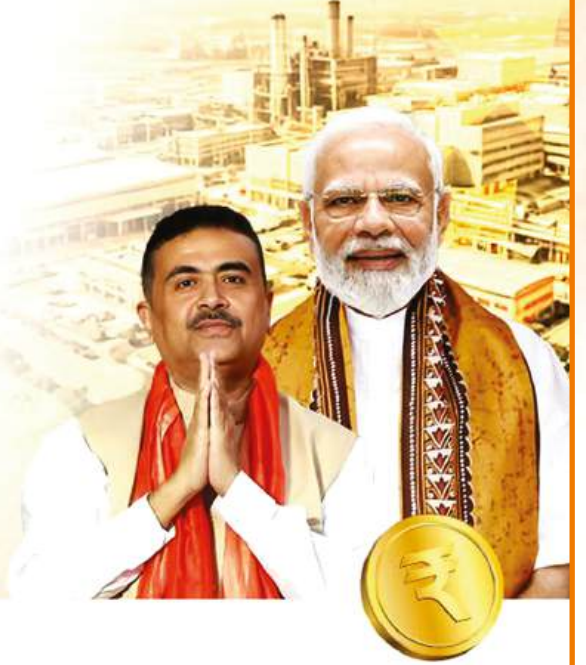


মীরাটে যুব সম্মেলনে বিজেপি জাতীয় সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ।



পশ্চিমবঙ্গের
শিল্পক্ষেত্রে আসছে
বড় বিনিয়োগ!

শিল্পের জন্য বরাদ্দ
জমি ২০২৬



৩৩

শিল্প সংস্থাকে জমি

৫৮০

একর জমি বরাদ্দ

৬২,০০০+

এরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে

₹৬০,০০০+ কোটি
বিনিয়োগ



জায়গাগুলি

হরিণঘাটা | খড়াপুর | পানাগড়
রঘুনাথপুর | কল্যাণী | সল্টলেকে

[f](#) [x](#) [v](#) [i](#) /BJP4Bengal [b](#) [j](#) [p](#) [b](#) [e](#) [n](#) [g](#) [a](#) [l](#) [o](#) [r](#) [g](#)

